প্রথম প্রকাশ—রাসপূর্ণিমা, ১৩৬৬
মূল্য ৪'৭৫ টাকা

প্রচ্ছদ
শ্রীসমর দে

প্রকাশক ও মুদ্রক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ
বোধি প্রেস। ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা ৬

নিবেদন

প্রথমেই একটি কথা সভয়ে নিবেদন করে রাখি। শ্রীঅরবিন্দের, রবীন্দ্রনাথের বা অন্য কোনো কবির লেখা আমি পড়ি আনন্দ পাবার জন্য, তত্ত্বকথা প্রচারের জন্য নয়। তার ব্যাখ্যা ও আলোচনাও করেছি সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, অর্থাৎ আমি যেটুকু নিজের মতন করে বুঝেছি সেটুকুই প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি। আমি জানি এর চেয়ে অনেক বেশী ভালো করে, বিচার বিশ্লেষণ করে, নানান্ দিক থেকে রবীন্দ্র বা অরবিন্দ কাব্যের আলোচনা করা যেতো—বলা যেতো নিবিড়তম অনুভূতির কথা, কাব্যজিজ্ঞাসার কথা, আন্তর প্রেরণার কথা, রচনাশৈলীর কথা। আমি তা পারিনি। কোন বিশেষ গোষ্ঠীর সঙ্গে আমার সজীব সংযোগ নেই, তাই তাঁদের পথ বা মতও ধরিনি। কবির জগত যেমন তাঁর নিজের সৃষ্টি, কবিতার পাঠক-পাঠিকাদেরও তেমনি নিজেদের অনুভূতির জগত সৃষ্টি করে নিতে হয়—সেই কক্ষ-পথেই তার বিস্তৃতি, তার আবাহন ও বিসর্জন। তাতেই তার সার্থকতা। পাঁচের দরবারে সেটা বাহ্য হলেও নিজেদের অন্তরের মাধুকরীতে তা গ্রাহ্য।

শ্রীঅরবিন্দ শুধু মহাযোগী বা বিরাট্ পণ্ডিত নন, তিনি গভীরতম অনুভূতিরও কবি। তাঁর প্রথমযুগের বহু লেখা সহজ সরল হলেও পরের যুগের অনেককিছু লেখা আমাদের কাছে শুধু ভাষায় দুর্গম নয়, ব্যঞ্জনাতেও সহজবোধ্য নয়, কারণ তা এমন এক চেতনায় জারিত যার সংবাদ আমরা রাখিনা, যে ভিতর-মহলের খবর আমাদের মনের মণিকোঠার বাহির-মহলে কদাচিৎ আসে। সেই কাব্যকে সঠিক বুঝতে গেলে, হয় নিজেকে তদ্ভাবভাবিত করে সেই গভীরে প্রবেশ

করবার অধিকার লাভ করতে হয়, না হয় প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সত্যিকারের অধিকারীদের কাছ থেকে জেনে নিতে হয়।

শ্রীঅরবিন্দের মানসমূর্তির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপূর্ব কবিতার মাধ্যমে—'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার'। কৈশোরের সেই আধো-আলো আধোছায়ার বয়ঃ-সন্ধির দিনে কবিগুরুর ভাব ও ভাষা আমার মনবীণায় যে চিন্ময় রসময়তার ঝঙ্কার তুলেছিলো, তারি অনুরণনে আজও আমার মনের গভীরে একাসনে বসে আছেন এই দুই কবি—মহান্ত দুই পুরুষ।

মনে পড়ে ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রবল মাতনে আকাশে বাতাসে প্রলয়ের গুরু গুরু মাদল বাজচে, যখন রেঙ্গুনে প্রতিদিন অনলবর্ষী বোমা পড়ছে, যখন স্ত্রীপুত্র কন্যাকে দেশে পাঠিয়ে দিয়ে একা পড়ে আছি বিদেশে, তখন সেই শশ্মানসম শহরে পরিজনপরিত্যক্ত দিনগুলিতে আমার সাথী ছিল শুধু কয়েকখানি বই। কতো ভীতত্রস্ত দিনে, কতো অশান্ত দুরন্ত রাত্রে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আর শ্রীঅরবিন্দের লেখা আমার মনে ক্ষীর ও নীর জুগিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। তখন কতবারই না মনে বেজেছে—

আজ সব কথা
মনে হয় শুধু মুখরতা
পুরাতন সে মন্ত্রের কাছে
ধ্বনিতেছে যাহা সেই নৈঃশব্দ চূড়ায়
সকল সংশয় তর্ক যে মৌনের গভীরে ফুরায়।

আর মনে হয়েছে হাতের কাছে রবীন্দ্রনাথ বসে আছেন—বৃক্ষ ইব দিবি স্তব্ধ। তিনি শুধু কবি নন—অপরূপ কবি; আমার মনের কবি—গানের কবি; বোধি চেতনায় দীপ্ত—ভাষার ইন্দ্রধনুতে শুধু ইন্দ্রজালই নয়, দূরের আলোকও বিকীরিত হচ্চে। সেই আলোকে শ্রীঅরবিন্দকে

দেখার লোভ আমি সংবরণ করতে পারিনি। তাই এই বইএর নামকরণ করেছি 'ছুই কবি', অর্থাৎ রবীন্দ্রকাব্যের আলোকে কবি শ্রীঅরবিন্দকে বোঝবার একটু সামান্য প্রয়াস। এর বেশী আর কিছু নয়। এটা তুলনামূলক সমালোচনা নয় অথবা রবীন্দ্র-অরবিন্দের ভাবধারার সমন্বয় চেষ্টাও নয়।

আর একটি কথা। শ্রীঅরবিন্দ কাব্য বিশাল এবং প্রায় সবটাই ইংরাজীতে। তাই তাঁর কাব্যের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়াও এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সম্ভব নয়, উদ্দেশ্যও নয় এবং মূল ইংরাজী উদ্ধৃতিও অপরিহার্য। মোটকথা এই বইটি শ্রীঅরবিন্দ কাব্যপাঠের একটি ভূমিকামাত্র। পরিশিষ্টে আমার কয়েকটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করে নিজের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করেছি।

১৯৫৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কবি শ্রীঅরবিন্দ' এই বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দিই। পরে ওই সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, এশিয়াটিক্ সোসাইটি, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট্ অফ কালচার, পি-ই-এন, রবিবাসর প্রভৃতি কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আমায় আলোচনার সুযোগ দিয়েছেন এবং বিশিষ্ট কয়েকটি মাসিকপত্র উহা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

এই বইটি আমি তাঁদেরই হাতে তুলে দিলাম যাঁরা আমাকে এই বই লেখায় পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন, উৎসাহ উদ্দীপনা ও প্রেরণা দিয়ে। শিক্ষিত বাঙালীর কাছে রবীন্দ্রসাহিত্য সহজাত কবচের মত। কিন্তু ইংরাজীতে লেখা অরবিন্দসাহিত্যের প্রতি আমাদের অনুরাগ সেরূপ ব্যাপক নয়। সে প্রেরণা প্রথমেই জুগিয়েছিলেন বালীর একনিষ্ঠ দেশসেবক শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় তাঁর বাঁধানো মূল "আর্যের" ফাইলগুলি আমায় পড়বার সুযোগ দিয়ে। তাঁর বৈঠক-খানায় সেকালে নিয়মিতভাবে অরবিন্দ কাব্যের আলোচনা হতো। আর হতো রবীন্দ্র কাব্যালোচনার ভূরিভোজের সঙ্গে কবিগুরুর গীতি-

কাব্যের মহড়া ও গান। এই সুপ্ত বীজকেই বহুবৎসর পরে উপ্ত করে তোলেন আমাদের এক বর্ষীয়ান্ বন্ধু অগ্রজপ্রতিম শ্রীনলিনীকান্ত সেন। তিনি এখন আশ্রমবাসী। তিনিই শ্রীঅরবিন্দ ও 'মাদারের' সহস্তে লিখিত আশীর্বাণী সমেত তাঁদের কয়েকখানি বই আমায় সংগ্রহ করে দেন, যেগুলি আমার জীবনে পরম পাথেয় স্বরূপ। শ্রীপ্রদ্যোত ভট্টাচার্য ও শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় থাকা কালে আমায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকার শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল মহাশয়ও প্রকারান্তরে আমাকে অরবিন্দ-সাহিত্যে অনুরাগী করেন শ্রীঅরবিন্দের 'কালিদাস' পড়তে দিয়ে আর বাংলায় অনুবাদ করবার জন্য বারংবার অনুরোধ করে। শ্রীঅমল হোম রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে নানা তথ্য শুনিয়েছেন। শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র এবিষয়ে অনেক আলাপ আলোচনা করেছেন। আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু অধ্যাপক ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের মূল্যবান মন্তব্য অনুযায়ী কবি শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কীয় অধ্যায়গুলির কিছু কিছু পরিবর্তন করেছি। সবশেষে শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র এগিয়ে না এলে এই বইটি এতো তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হতো না। সুসাহিত্যিক শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল প্রুফ্ দেখে দিয়েছেন।

এঁদের সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচী-সংকেত

এই বইটি এমনভাবে লেখা নয় যে একে সুনির্দিষ্ট পরিচ্ছেদে ভাগ করা যায়। তবে যে যে বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে তাদেরই সূত্রাকারে একটা মোটামুটি পরিচয় দেওয়া হলো। বন্ধনীর মধ্যে আলোচনাগুলির পারম্পর্য একজাতীয়।

পৃষ্ঠা

পরিশিষ্ট



॥ এক ॥

মানুষের আত্মিক ইতিহাসে কখন যে কি ঘটে, বাইরের প্রকাশে তাকে অনেক সময়েই ধরা যায় না। চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শুনে, ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করে, রূপ রং স্পর্শের সীমায়, ঘটনার পারম্পর্য দিয়ে, যুক্তিতর্ক করে, বিচারবিশ্লেষণ করতে বসে অনেক সময়েই দেখা যায় যে কোথায় যেন একটা মস্ত ফাঁক থেকে যাচ্ছে।

একই যুগে, একই দেশে, প্রায় একই সময়ে ভাগ্যবান আমরা, অনেক পুণ্যের জোরে পেয়েছিলাম বহু মনীষাসম্পন্ন যুগন্ধর মহাপুরুষদের। নমস্য তাঁরা, প্রণম্য তাঁরা, বরণীয় তাঁরা। ইতিহাসের পুরোগামিনী গতিতে এক একটি করে তাঁরা রক্ষাকবচ বেঁধে দিয়ে গেছেন,—যে মন্ত্রের জোরে, যে সমন্বয়ের সূত্রে, যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনে আজও তাঁদেরই উত্তর পুরুষ আমরা, কথা বলছি, গান গাইছি, নৃত্য করছি, বাচালতা প্রকাশ করছি, ধ্যান-ধারণায় স্তব্ধ হচ্ছি। তবু বারে বারে এই পিতৃরিক্থকে অশ্রদ্ধা করবার মতো প্রবৃত্তিও জাগছে। এই রসমালঞ্চের প্রধান মালাকরদের মধ্যে বিশেষ করে মনে পড়ছে দুই দিকপালের কথা—যেন হরি আর হর—দুই কবিমনীষী—রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ। তাঁরা শুধু জ্ঞানী গুণী শিক্ষাব্রতী স্বদেশহিতব্রত দার্শনিক নন, কর্মী তাপস সাধক নন, সব চেয়ে বড় কথা, কবি—অপরূপ কবি! রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন যে, কবিগুরুর দিকে চেয়ে আমাদের বিস্ময়ের সীমা নেই। ঠিক এই কথাই শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধেও বলা যায়—

বন্ধন পীড়ন—দুঃখ অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি কর্ণে মোর বাজে

আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান—
মহাতীর্থযাত্রীর সঙ্গীত, চিরপ্রাণ,
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয় বাণী
উদার মৃত্যুর···

স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দকে বলছেন—তুমি ত শুধু বন্ধু নও, দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি—দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়, সত্যের গৌরবদীপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায় সেই পূর্ণ অধিকার চেয়েছিলে।

শ্রীঅরবিন্দ তখনকার দিনে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলছেন—"Young Bengal gets its ideas, feelings and culture not from Schools and Colleges but from Bankim's novels and Rabindranath Tagore's poems; so true is it that the language is the life of a nation." নব্য বাংলা বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের কাছেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির পাঠ নেয়। আবার দেখি, রবীন্দ্রচিত্ত উদ্বেল হয়ে উঠছে, আকুল হয়ে উঠছে শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে—একটি চিঠিতে দেখি, কবিগুরু লিখছেন—অরবিন্দকে যদি জেলে দেয়, তাহলে বন্দেমাতরমের কি হবে?

কবিগুরুর মৃত্যুর পর শ্রীঅরবিন্দ এক পত্রে বললেন—Tagore has been a wayfarer towards the same goal as ours in his own way—that is the main thing, the exact stage of advance and putting of the steps are minor matters.—একই পথের যাত্রী আমরা একই লক্ষ্য, সেইটেই আসল—কে কতটা এগুলো সেইটে বড় কথা নয়।

রবীন্দ্রনাথের অনুপম ভাষায় কবি শ্রীঅরবিন্দকে ডেকে বলা যেতে পারে—

যৌবন বেদনা রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি
হে কালের অধীশ্বর
অন্যমনে গিয়েছ কি ভুলি···

গন্ধভারে আমন্থর বসন্তের উন্মাদন রসে
ভরি তব কমণ্ডলু নিমজ্জিল নিবিড় আলসে মাধুর্য রভসে।

Life's joy, warmth, sensuousness-এর মধ্যেও দুজনকে আমরা দেখেছি, আবার দেখেছি ধ্যানমগ্ন চৈতন্যের জ্যোতির্লোকে। এই অপরূপতার জন্যই দুই কবি নমস্য—কাব্যের এই যে দ্বৈত রূপ তা কম কবির লেখাতেই মেলে। এই দ্বৈতই মিলেছে পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগরসংগমে, সাহিত্যে সহজ হয়ে।

॥ দুই ॥

যে যুগে রবীন্দ্রনাথ জন্মালেন সে যুগ সত্যই সব দিক দিয়ে বাংলার মননের ইতিহাসে এক ঋতু-পরিবর্তনের যুগ। ১৮৬১ সালের মে মাস সিপাহী বিদ্রোহের মাত্র চার বছর পরের ঘটনা। পশ্চিমের দুর্বার স্রোত বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাসের পশরা নিয়েই ধাক্কা দিচ্চে না, শুধু রেল, টেলিগ্রাফ, ডাকঘরকেই নিয়ে আসছে না, আনছে জীবনযাত্রার অভ্যস্ত উপকরণের বাইরের বহু জিনিস। শিক্ষার নতুন রীতিনীতি গৃহীত হচ্চে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নাবালক হলেও সুপ্রতিষ্ঠিত। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ-পর্ব সামাজিক শান্ত জীবনে আগুনের পরশমণি ছুঁইয়েছে। বহু বিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হচ্চে তীব্র। রামমোহনের নেতৃত্বে যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা, দেবেন্দ্রনাথের আনুকূল্যে ও কেশব সেনের বাগ্মিতায় যার প্রতিপত্তি, সেই সমাজ তখন বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে যৌবন শতদলে টলমল করছে। ওদিকে আন্তর জীবনের আর এক বিপ্লবের ভিত্তি স্থাপন হচ্চে দেখতে পাই। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর কোলে দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন রাণী রাসমণি—দেবী ভবতারিণী নামছেন আকাশ বেয়ে, মেঘাঙ্গী বিদ্যুৎবাহিনী এলোকেশী। কেউ

কেউ শুনতে আরম্ভ করেছে যে গদাধর চট্টো বলে এক আধাপাগলা সাধু সন্ন্যাসী গোছের মানুষ সেখানে আস্তানা গেড়েছে। বাঙালী শিক্ষিত সমাজের কিছু লোক সেখানে যাতায়াত সুরু করেছেন। ভোরের আগের যে প্রহরে দেবতাদের ঘুম ভাঙে, সেইক্ষণ বুঝি এসে গেলো— তাই বুঝি নিবিড় আঁধার-মাঝে অরূপরাশি চমকাচ্চে।

সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্চে সে-যুগে জীবনে এসেছে একটা নতুন স্বীকৃতি, নতুন দিগ্‌দর্শন। দেশের জ্ঞানী গুণী চিন্তাশীল মনস্বী যশস্বীরা আত্মসম্বিৎ ফিরে পাচ্চেন। ভারতপথ পথিক বাংলাদেশ নতুন গল্প শুনছে, নতুন কথা বলছে, নতুন রহস্যে জেগে উঠছে। এক রস-সঞ্জীবনী প্রাণবন্যা দুকূল ছাপিয়ে চলেছে। বহুকালের বহু স্মৃতির বহু বৃহস্পতির মননে ভরা যে যুগ। রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ মনীষীরা একদিক দিয়ে তাঁদেরই উত্তর পুরুষ, আবার সেই প্রাণযজ্ঞের রূপান্তরিত উত্তর সাধকও বটে।

সাহিত্যেও ঈশ্বরগুপ্তের 'প্রভাকর', দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোন-প্রকাশ', দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বা 'আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'কে ছাড়িয়ে প্রায় বঙ্কিম-মধুসূদনের যুগে এসে গেছি বললেই হয়। এ ছাড়া ছিল যে বাড়ীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার প্রভাব ও পরিবেশ। তাঁর নিজের কথাতেই বলি "যে সংসারে প্রথমে চোখ মেলেছিলুম সে ছিল অতি নিভৃত। শহরের বাইরে শহরতলীর মত, চারিদিকে প্রতিবেশীর ঘরবাড়ীতে কলরবে আকাশটাকে আঁট করে বাঁধেনি। আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধাঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। আচার অনুশাসন ক্রিয়াকর্ম সমস্তই বিরল।...আমি এসেছি যখন, এ বাসায় তখন পুরাতন কাল সদ্য বিদায় নিয়েছে, নতুনকাল সবে এসে নামল, তার আসবাবপত্র তখনও এসে পৌঁছয়নি।

"...আমি ধনের মধ্যে জন্মাইনি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও নয়...এই

পরিবারের বাংলাভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল সুগভীর, তার ব্যবহার ছিল সকল কাজেই···আমাদের বাড়ীতে আর একটি সমাবেশ হয়েছিল সেটি উল্লেখযোগ্য। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্-পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক। এর থেকে বুঝতে পারা যাবে সাধারণতঃ বাংলা দেশে ধর্মসাধনায় ভাবাবেগের যে উদ্বেলতা আছে আমাদের বাড়ীতে তা প্রবেশ করেনি। পিতৃদেবের প্রবর্তিত উপাসনা ছিল শান্ত সমাহিত···

"আর একটা জিনিস ছিল সেটি হচ্চে ··গুরুজনদের মধ্যে ইংরেজী সাহিত্যের আনন্দ ছিল নিবিড়"।

এরি কিছু পরে দেখি নবনাটক অভিনীত হচ্চে, দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বপ্নপ্রয়াণ লিখছেন, বিহারীলাল সারদামঙ্গল পড়ছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংগীত-বিজ্ঞানের সাধনা করছেন, বালক রবীন্দ্রনাথ গাইছেন "ময় ছোড়োঁ ব্রজ কি পিয়ারি", পড়া হচ্চে মেঘদূত, উত্তররামচরিত, ফরাসী কাব্য ও ইতিহাস, শেলী বায়রন কীটস, আলোচনা হচ্চে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, নিরীশ্বরবাদ, হারবার্ট স্পেন্সার, জন স্টুয়ার্ট মিল, কাঁত কোমত, মোক্ষ-মূলর, ডয়সন জেকবী—সারা বাড়ী গম্‌গম্ করছে হাস্যে লাস্যে আলাপে আলোচনায়, মুখরিত হচ্চে উচ্ছ্বসিত আনন্দে।

আবার আর একদিকে ভৃত্যরাজক তন্ত্র, পারিবারিক আইনকানুন-গুলো নিয়মের নিগড়ে বন্দী, এমন কি বাড়ীর ভিতরের ছাদের প্রাচীর ও অচলায়তনের সীমানা, মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। তারপর "যখন একটু বড়ো হইয়াছি এবং চাকরদের শাসন কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছে, যখন বাড়ীতে নূতন বধূসমাগম হইয়াছে এবং অবকাশের সঙ্গীরূপে তাঁহার কাছে প্রশ্রয় লাভ করিতেছি, তখন, এক-একদিন মধ্যাহ্নে সেই ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইতাম।

খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখী ছিল বনে।
একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে
কি ছিল বিধাতার মনে।”

এমনি সময়ে অভিভাবকদের উদ্যোগে চলেছে নানা বিদ্যার আয়োজন, কানা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি থেকে বোপদেবের সূত্র ও অস্থিবিদ্যার হাড়ের নামগুলো মুখস্থ পর্যন্ত। নর্মাল স্কুলে ইংরেজী গান শিখছেন কবি—কলোকী পুলোকী সিংগিল, মেলালিং মেলালিং, মেলালিং, অর্থাৎ ঘষে মেজে বাদ দিয়ে সুসভ্য হয়ে যা দাঁড়ায়—full of glee singing merrily, merrily, merrily। ওদিকে সীতানাথ তত্ত্বভূষণ শেখাচ্চেন যন্ত্র-তন্ত্রযোগে প্রাকৃত বিজ্ঞান, হেরম্ব তত্ত্বরত্ন একেবারে ‘মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং’, নবগোপাল মিত্র কবিতা শুনছেন ‘দ্বিরেফ’ শব্দ দিয়ে। আর সন্ধ্যা বেলায় ঘটছে একটি শোচনীয় ঘটনা—মাষ্টারমশাই পড়াতে আসছেন তিনটি নিদ্রাতুর বালককে। কবির নিজের অপূর্ব ভাষাতেই বলি ‘সন্ধ্যা হইয়াছে; মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; রাস্তায় এক হাঁটু জল দাঁড়াইযাছে। আমাদের পুকুর ভরতি হইয়া গিয়াছে; বাগানের বেলগাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলা জলের উপর জাগিয়া আছে; বর্ষাসন্ধ্যার পুলকে মনের ভিতরটা কদম্বফুলের মতো রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। মাষ্টার মহাশয়ের আসিবার সময় দু'চার মিনিট অতিক্রম করিয়াছে। তবু এখনো বলা যায় না। রাস্তার সম্মুখের বারান্দাটাতে চৌকি লইয়া গলির মোড়ের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি। ‘পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবতুপযানং’ যাকে বলে। এমন সময় বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন হঠাৎ আছাড় খাইয়া হা হতোঽস্মি করিয়া পড়িয়া গেল। দৈবদুর্যোগে-অপরাহত সেই কালো ছাতাটি দেখা দিয়াছে। হইতে পারে আর কেহ। না, হইতেই পারে না। ভবভূতির সমানধর্মা বিপুল পৃথিবীতে মিলিতেও পারে কিন্তু সেদিন

সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরই গলিতে মাষ্টার মহাশয়ের সমানধর্মা দ্বিতীয় আর কাহারো অভ্যুদয় একেবারেই অসম্ভব।”

এই ছিল রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ। তার ঠিক এগারো বছর পরে শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাব। যুগধর্মের বিকাশ প্রায় একই, কিন্তু পরিবারের পরিবেশ বিভিন্ন।

॥ তিন ॥

একটি কথা আমাদের স্পষ্ট করে মনে রাখা দরকার যে শ্রীঅরবিন্দের মানসগঠনে শুধু ইংরাজী বা ফ্রেঞ্চ, গ্রীক বা লাতিনই প্রভাব বিস্তার করেনি, আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য, সাহিত্য, কাব্যও বিশেষ স্থান পেয়েছে। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীমদভগবদগীতা যেমন তাঁকে উদ্বেলিত করেছে তেমনি করেছে ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস প্রভৃতি কবিরা। শুধু সেকালের নয়, একালেরও যেমন বঙ্কিম, মধুসূদন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও সে কথা বলা যায়। যে যুগে তাঁরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে যুগ বিস্তারের যুগ, বিশ্লেষণের যুগ, বিপ্লবের যুগ। বাঙালী তখন বিশ্বরূপ দেখছে, অর্থাৎ তার জাতীয় জীবনে বাহির দুয়ারের কপাট খুলেছে, প্রতীচীর দুর্বার শক্তি তাকে ধাক্কা দিচ্ছে, নতুন দিনের নতুন স্বপ্ন, নতুন রস, নতুন চিন্তা, নতুন আলোক। সে পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করছে, তার রসবস্তুকে গ্রহণ করছে— এ এক অপূর্ব সমীকরণের যুগ। এই বিচিত্র যুগের, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই দুই কবি—রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে তাঁরা ছিলেন যুগমানব, আবার আর একদিক থেকে দেখতে গেলে তাঁরা সত্যের মর্মোদ্ঘাটন করে ক্রান্তদর্শী পথিক, আরো এগিয়ে চলে গেছেন।

যুগের প্রভাব থাকবে, কিন্তু যুগকে অতিক্রম করে চলে যেতে হবে, আমাদের ইতিহাসে এই গতিময়তা বারে বারে ঘটেছে। অনেকে বলেন, আমরা তার্কিক, আমরা ভাবুক, আমাদের চরিত্রে স্থৈর্য নেই, দার্ঢ্য নেই, প্রতিভার স্ফুরণ আছে, ভাবোদ্বেল উচ্ছ্বাস আছে, কিন্তু আঁকড়ে ধরবার শক্তি নেই। হয়তো এই অভিযোগগুলি মিথ্যা নয়, কিন্তু একটি সত্য আমরা পেয়েছি, আমরা চলেছি। দ্রাবিড়, আর্য মঙ্গোল, প্রটোঅষ্ট্রলয়েড, ভেড্ডিড, ইণ্ডিড, মেলানিডের মিশ্রিত রক্তে ভাবে মননে আছে নানা ধারার স্রোতধ্বনি—কিন্তু তবু গড়ে তুলেছি আমরা এক সমন্বয়ী সংস্কৃতি—সবার পরশে পবিত্র করা। হয়তো আছে "কর্মনাশা ভেদবুদ্ধির সর্বনাশা বিস্তার" যার জন্য আমাদের আসন আজ সংকীর্ণ ও অসম্মানিত। নানা ভুল আমরা করেছি, অহমিকায় চঞ্চল হয়েছি, কিন্তু সাহিত্যে, সাধনায়, সংস্কৃতিতে আমরা শুধু ভারতপথপথিক নই, বিশ্বপথপথিকও। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে অখণ্ড ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে দেখলে এই প্রশ্নটিই জাগে—আমাদের দেশ শুধু কি একটা ভৌগোলিক সীমায় নিবদ্ধ না তার একটা আদর্শের, ঐতিহ্যের, সংস্কৃতির রূপরেখাও আছে। ইতিহাসের গভীরে তার সত্যকার সত্তাটিকে বিশ্লিষ্ট করে বেত্তার দৃষ্টি দিয়ে যিনি আমাদের মনের ইতিহাস পড়েছেন তিনিই জানেন আমাদের জয়যাত্রা সেইদিনই হয়েছে যেদিন আমরা স্বপ্ন দেখেছি ভূমার, যেদিন আমরা বেরিয়ে পড়েছি শুধু ভল্লশূল শল্য নিয়ে নয়, আদর্শ নিয়ে, চিন্তা নিয়ে, ধ্যান ধারণা নিয়ে, সেবার মন্ত্র নিয়ে, দরিদ্রকে নারায়ণ জ্ঞান করে। টয়েনবীয়ান্ ফর্মুলা দিয়ে বাংলার ইতিহাসকে প্রতীক করে অন্তর্জগতের এই বিচিত্র রূপটি বহির্জগতেও কিছুটা ধরা যায় ইতিহাসের পাতায়। ধরুন—বাংলার ইতিহাসের পাল-সেন যুগ, বৈষ্ণব মধ্যযুগ, ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগ। প্রথমযুগের প্রথমপাদে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবসানে প্রকৃতিপুঞ্জ রাজলক্ষ্মীর প্রসারিত কর গোপালের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে

'শাশ্বতী প্রাপ শান্তিং'। সেদিনকার শ্রমণ, নাবিক, রসিক, ছড়িয়ে পড়েছিলো দ্বীপময় ভারতে, বালি, জাভা, কাম্বোডিয়া, চম্পা, চীন, শ্যাম সুবর্ণভূমিতে, তুষারশীর্ষ নেপালে, পামিরে, ভোটানে, তিব্বতে, সমুদ্রধৌত সিংহলে। সেদিনকার ভাষা গঙ্গার জলের মতই গভীর ছিল। শুধু জয়দেব শরণ ধোয়ী নয়, দত্ত, নাগ, মিত্র রক্ষিত প্রভৃতি বহু বাঙালী কবির পরিচয় পাই। নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে বাংলার শ্যামল সমৃদ্ধির শ্রীবৃদ্ধির চিত্র দেখি, প্রাকৃত পৈঙ্গলে তার ভোজন বিলাসের কথা পড়ি। সেদিনেও সে বেরিয়েছে, চলেছে, সে অর্জন করেছে, সে বর্জন করেনি। তার পারমিতাকে নিয়ে সে যোগিনীচক্রের মূলাধার থেকে সহস্রারে প্রতিষ্ঠিত করেছে, বরবোদূরে, আংকরে ভাষায় ভাষায় গিঠ পড়েছে। জাভার শৈলেন্দ্র নরপতিরা, প্রাম্বানানের মন্দির-নির্মাতারা, পাগানের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ উৎসর্গপত্রের রচয়িতারা, জাপানের হরউজী মন্দিরের বর্ণমালার লেখকরা সকলেই চেয়ে থাকতো নদীমেখলা সাগরচুম্বিতা তমালতালী-বনরাজী-নীলা হরজটাভ্রষ্ট ভাগীরথীর উপকূল-ভূমির দিকে। সেদিন ভুসুক চণ্ডালীকে গৃহিণী করতে পশ্চাৎপদ হয়নি, মন্দিরে মসজিদে পথ ঢাকলেও এক গুরুর সহজ ডাক শুনতে ভুল করেনি। আবার তারাই পরিহাসকেশবের মন্দিরে কাশ্মীরের উপত্যকায় নতুন ইতিহাস রচনা করলে। কতো গর্গ, দর্ভপাণি, হলায়ুধমিশ্র, বোধিদেব, গুরুবমিশ্র, কেদার মিশ্র, দীপঙ্কর, অতীশ, তারানাথ, চন্দ্রগোমী, বসুবন্ধু, সন্ধ্যাকর নন্দী বাঙালীর রসিকচিত্তে ফুটে উঠেছিল তার ইয়ত্তা নেই। সেদিন একদিকে যেমন পুরানোকে ধরে থাকার মত খণ্ডিত চিত্ত ছিল না, তেমনি আস্পৃহা ছিল নূতনকে পাবার, নূতনকে দিবার। সেদিনের ধর্ম তাই ছিল সহজ ধর্ম, রসিক ঐতিহ্যের সমন্বয়সন্ধানী এক অপূর্ব মন্ত্র। দ্বিতীয় যুগেও সেই কথা। শৈবশাক্ত দিন পেরিয়ে, বল্লালসেনী কৌলীন্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করে, মঙ্গলকাব্যের রসপান করে, দনুজমর্দন দেবকে নমস্কার করে যখন

দেশের মর্মস্থলে পৌঁছানো গেলো, তখনো সেই এক পন্থা। বাঙালী চলেছে, ভারতপথপথিক হয়েছে, ভালোবেসেছে, নাম দিয়েছে, প্রেম দিয়েছে, শরণ দিয়েছে। সে চলেছে দাক্ষিণাত্যে, নীলাচলে, বৃন্দাবনে। রায় রামানন্দ, স্বরূপদামোদর, শিখী মহান্তীর শিষ্যত্বেই তার অভিযানের অবসান হয়নি। সেদিন, বাঙালী সংস্কৃতির ঐতিহ্যময় প্রবণতা বাংলার সীমা অতিক্রম করে গুর্জরে, মহারাষ্ট্রে, দাক্ষিণাত্যে, আসামে, উৎকলে, মিথিলায়, প্রভুর বেশে নয়, সেবকের রূপে প্রবেশ করেছিল। এও এক সমীকরণের যুগ—বাইরে থেকে ধাক্কা দিচ্ছে ইসলামের চণ্ডবেগ, প্রচণ্ড আঘাতে কাঁপছে দেশ ও দশ। তারই মধ্যে বাঙালী বসেছে মহাভারতীর সাধনায়। এই দুই যুগের কথা একটু বিশেষ ভাবেই লিপিবদ্ধ করলাম এইজন্য যে বাংলার তৃতীয় যুগ, যে যুগে রামমোহন থেকে রবীন্দ্র-শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাব, সে যুগ, সেই ঐতিহ্য-ধারার মূল সূত্রটিকে বহন করে নিয়ে এসে নতুন করে বিস্তীর্ণ করে সমগ্র দেশের মানসে ছড়িয়ে দিলে। এই একশো বছরের ইতিহাস—এক রসঘন রসায়নের ইতিহাস, প্রাণসঞ্জীবনী রসবন্যার ইতিহাস—একশো বছর পেয়েছিল হাজার বছরের বিস্তৃতি, ত্রিকালের ছাপ লেগেছিল তার সর্বাঙ্গ ব্যেপে, ত্রিকালের রূপ—অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যত নিয়ে যে ত্রিকাল, স্মৃতি, চিন্তা, আশা যার প্রতীক্। এই যুগের শিল্পী, কবি, কর্মী, দেশনায়ক, সাহিত্যিক সকলেই দেশমাতৃকার এক যজ্ঞসম্ভব মূর্তি গড়ে তুলতে চাইলেন, পূর্ণাহুতির সমিধ সংগ্রহ করলেন, প্রতীচীর জ্ঞান বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস রাষ্ট্রবোধ, রসবস্তু আহরণ করলেন, শুনলেন অনুশীলনের ছন্দ, কর্মযোগের ব্যাখ্যা, ভাগবতজীবনের প্রয়াস, নূতন গীতাঞ্জলি, জীব ও শিবের গান। উপরের উচ্ছৃঙ্খলতার নিম্নে গড়ে উঠলো এক নিষ্ঠা, এক তপস্যা, এক সমীকরণের চেষ্টা, যার পুরোহিত রামমোহন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বঙ্কিম বিদ্যাসাগর কেশব দেবেন্দ্র মাইকেল ভূদেব রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দ

প্রভৃতি মনীষীরা। রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন তারি এক সুন্দর সুষ্ঠু বিচিত্র রূপময় ধ্যানময় প্রকাশ—যুগমানব যুগকে অতিক্রম করে বহু উর্দ্ধে চলে গেছেন—যুগস্রষ্টা শুধু পুরাতন মানগুলিকে (values) পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করছেন না, নতুন দৃষ্টির সন্ধান দিচ্ছেন, নতুন সৃষ্টিও প্রবর্তন করছেন ভাবে ভাষায় রূপকে প্রতীকে ছন্দে মীমাংসায়, গানে, গল্পে, সুরে। শ্রীঅরবিন্দের সৃষ্টি কিন্তু শুধু কবির সৃষ্টি নয়, সাধকেরও সৃষ্টি নয়, যোগীরও সৃষ্টি নয়—ইহাসনে বসে একটি সম্পূর্ণ রসিক ভাগবত সৃষ্টির প্রয়াস, দিব্যচক্ষুর দৃষ্টি। শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথাতেই বলি "দিব্যচক্ষু কি ? কল্পনার চক্ষু নহে, কবির উপমা নহে— যোগলব্ধ দৃষ্টি।"

॥ চার ॥

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানি, অনেক কিছু পড়ি, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি অল্প, জাতির জীবনে কী তাঁর মহান দান, বিশ্বের ইতিহাসে কোন্ অপূর্ব রসসমৃদ্ধ অধ্যায় তিনি যোজনা করলেন, তাঁর পূর্ণযোগ বলতে আমরা কী বুঝি, এ সব বিষয়ে আমাদের সুষ্ঠু সুসংযত ধারণা ত নেইই, বরং অনেককেই ডিক্রী ডিস্‌মিস্ করতে দেখেছি যে শ্রীঅরবিন্দের লেখা দুর্বোধ্য, তাঁর সাধন-ভজন মানুষ বোঝে না। অবশ্য দুটি গুণ সবাই স্বীকার করে নেন, যে, এককালে তিনি ছিলেন উগ্ররকমের স্বাদেশিক বিপ্লবপন্থী, দেশ-হিতপ্রাণ মানুষ, আর অত্যন্ত উঁচুদরের পণ্ডিত জ্ঞানী ও গুণী। দেশের জন্য ছিল তাঁর যেমন অদ্ভুত মমত্ববোধ, তেমনি অনাসক্তিও। এই বিচারের বাইরে কিন্তু আর-এক অরবিন্দ বসে আছেন, যাঁর কথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই বা জানি না—তিনি হচ্ছেন কবি শ্রীঅরবিন্দ

—যিনি সাধক অরবিন্দ, কর্মী অরবিন্দ, তাপস অরবিন্দকে জড়িয়ে ও ছাড়িয়ে এক মহান মূর্তিতে আমাদের সম্মুখে স্বয়ংদীপ্ত হয়ে বিরাজমান। তাঁর কাব্যের গোমুখীর ধারায় সব পথ এসে মিশে গেছে, সব নীরবতা বিলীন হয়ে আছে, কর্মের স্ফুলিঙ্গ বিরাট সাবিত্রী-যজ্ঞের সমিধ হয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয় প্রায় একই সময়ে একই দেশে ভারতের দুই মহাকবি দুই প্রান্ত থেকে কাব্য-সরস্বতীর পূজা আরম্ভ করলেন, একজন ইংরাজীতে, একজন বাংলায়. কিন্তু তাঁদের কবিচেতনায় যে সাদৃশ্য আছে সেকথা অনেকেই স্মরণ করেন না। একজন বাংলার জোড়াসাঁকোয়, শিলাইদহে, পদ্মার তীরে, ভুবনডাঙার মাঠে, ঝংকার-মুখরা এই ভুবনমেখলাকে নিয়ে, রূপ হতে রূপে, প্রাণ হতে প্রাণে চলেছেন ; আর একজন বরোদায়, নর্মদার তীরে, মারাঠার প্রান্তর হতে পাঠালেন তাঁর বজ্রশিখা—'আঁকিদিল দিগন্তে যুগান্তের বিদ্যুৎবহ্নিতে, মহামন্ত্রলিখা।'

এক সুসমৃদ্ধ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক পরিবেশের মধ্যেই রবীন্দ্র-নাথের সহিত শ্রীঅরবিন্দের প্রথম আত্মিক পরিচয়। শ্রীঅরবিন্দ মালা দিয়েছিলেন, পদলোলুপ রাজনৈতিককে নয়, বাক্যবাগীশ সংস্কারককে নয়, তাঁদের, যাঁরা সৃষ্টি করে গেলেন একটা ভাষা, একটা সাহিত্য, একটা জাতি। তিনি মালা দিলেন, বঙ্কিমকে, মধুসূদনকে ও রবীন্দ্রনাথকে। দ্বিতীয় আত্মিক পরিচয়ের যুগ হলো স্বদেশীযুগ। একটা জাতির, একটা যুগের মন মন্থিত শঙ্খনাদের প্রতীক হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। সেই অরবিন্দকেই নমস্কার জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তৃতীয় আত্মিক পরিচয়ের যুগ হচ্ছে সেদিন যেদিন কবি-গুরু শ্রীঅরবিন্দকে দেখলেন তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে, অপ্রগলভ স্তব্ধতায়। সেদিনও তিনি তাঁর নমস্কার জানিয়ে এসেছিলেন। তাঁরই কথায় বলি—

"অনেক দিন মনে ছিল অরবিন্দ ঘোষকে দেখ্‌বো। সেই আকাঙ্ক্ষা

পূর্ণ হলো···ভাঙা শরীর নিয়ে যথেষ্ট কষ্ট করেই নামতে হলো—তা হোক্···দেখা হয়েছে। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম - ইনি আত্মাকেই সব চেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বললে, ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাইরের আলো জ্বালবেন। কথা বেশী বলবার সময় হাতে ছিল না। অতি অল্পক্ষণ ছিলুম। তারি মধ্যে মনে হলো, তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণাশক্তি পুঞ্জিত। কোনো থর-দস্তুর মতের উপদেবতার নৈবেদ্যরূপে সত্যের উপলব্ধিকে তিনি ক্লিষ্ট ও খর্ব করেননি। তাই তাঁর মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্যময় শান্তির উজ্জ্বল আভা। মধ্যযুগের খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে রিক্ত শুষ্ক করাকেই চরিতার্থতা বলেননি। আপনার মধ্যে ঋষিপিতামহের এই বাণী অনুভব করেছেন, যুক্তাত্মনঃ সর্বমেবাবিশন্তি। পরিপূর্ণ যোগে সকলের মধ্যে প্রবেশাধিকার আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার। আমি তাঁকে বলে এলাম—আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় থাকবো। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে, শৃণ্বন্তু বিশ্বে।

প্রথম তপোবনে শকুন্তলার উদ্বোধন হয়েছিল যৌবনের অভিঘাতে —প্রাণের চাঞ্চল্যে। দ্বিতীয় তপোবনে তার বিকাশ হয়েছিল আত্মার শান্তিতে। অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে অপ্রগলভ স্তব্ধতায়—আজও তাঁকে মনে মনে বলে এলুম—অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।"

দুই মহাকবির কাব্যেই এই আত্মার গানেরই বিভিন্ন ভঙ্গীতে বিভিন্ন প্রকাশ দেখি, স্তব্ধ হয়ে শুনি, অনুভব করি, মানুষকে বাদ দিয়ে

নয়, তাকে ঊর্ধ্বে তুলে। একজন স্থিতির কবি, আর একজন গতির, একজন ধ্যাননিমগ্ন নীরব মগ্ন মহাযোগী, আর একজন নটরাজের কবি-শিষ্য, তাঁর লীলা সহচর। মাটির কবি দুজনেই, আকাশের কবি দুজনেই—একজন চাওয়া পাওয়া আশ্চর্য মাধুর্যের লীলার মধ্যেই সত্তাকে খুঁজে পেলেন, আর-একজন তাকেই রূপান্তরিত করে ঊর্ধ্বের সোনায় পরিণত করলেন। এই দুই মহাকবি দুই ধারাকেই শুধু বহন করে নিয়ে যাননি তাঁদের দৃষ্টির বৈশিষ্ট্যে, বক্তব্যের বৈচিত্র্যে অপরূপ করে তুলেছেন। তার উপমা উর্বশী, তার উপমা সাবিত্রী।

॥ পাঁচ ॥

১৮৭২ খৃঃ অব্দের ১৫ই আগষ্ট মর্ত্যকায়ায় যাঁকে দেখি, ১৯৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর তাঁরই মহাপরিনির্বান। এই আবির্ভাব ও তিরো-ভাবের দুই কোটির মাঝখানে ১৮৭২-৭৯ সাতবছর বাল্য ও কৈশোরের যুগ, ১৮৭৯-৯৩ এই চৌদ্দ বছর বিলাতে প্রবাস বা শিক্ষার যুগ, ১৮৯৩-১৯০৬ বরোদাবাস বা আন্তর প্রস্তুতির যুগ, ১৯০৬-১৯১০ এই চারি বৎসর কলিকাতা-বাস ও কর্মযোগীর যুগ আর ১৯১০-৫০ এই চল্লিশ বছর আত্মসমাহিতির যুগ। এই সীমার মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছেন মানুষ ও স্বাদেশিক অরবিন্দ, কবি ও দার্শনিক অরবিন্দ, সাধক ও যোগী অরবিন্দ।

শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু ছিলেন সেকালের প্রগতিপরায়ণ বাঙালী সমাজের একজন সুযোগ্য নেতা। বাংলায় তখন পশ্চিমের সংস্কৃতির মাধ্যমে শিক্ষা ও দীক্ষার ঢেউ জোরে ধাক্কা দিচ্ছে—জোয়ারে ডুবু-ডুবু নবীন বাংলার মন বিলাতের দিকে চেয়ে আছে আলোর জন্য—নিবাত নিষ্কম্প একটি দীপশিখার জন্য তার চিত্ত আকুল। এই প্রবল আলোড়নের

তপ্ত কটাহে ভেসে যাচ্ছে শুধু ডিরোজিয়ো-রিচার্ডসনের ছাত্রেরাই নয়, অনেকদিনের অনেককিছু সমাজ-বিন্যাসের রীতি-নীতি। এই সমুদ্র-মন্থনের ধারকরা নাম দেওয়া হয়েছে 'রেনাসাঁস' বা নবজাগৃতির যুগ। এই যুগেরই একটি মানুষ ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ—রাজনারায়ণের জামাতা। তাঁরই তৃতীয় পুত্র শ্রীঅরবিন্দ। নিজের ছেলেমেয়েদের সম্পূর্ণরূপে সাহেব করে তুলবেন এই ছিল তাঁর আশা, তাঁর স্বপ্ন, তাঁর আকাঙ্ক্ষা।

প্রায় আশী বছর আগে তখনকার দিনের ইঙ্গবঙ্গ সমাজের এই মধ্যমণি ছেলেদের নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিলেন যে তাদের বিলাতে শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে উচ্চশিক্ষিত করিয়ে নিয়ে আসবেন। ভারতে তখন সেই যুগের রেশ চলছে যখন মনে হতো পশ্চিমের জ্ঞানবিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস রাষ্ট্রবোধের চেতনাই শুধু একমাত্র কাম্য নয়, বিধিনির্দিষ্ট পথও বুঝি। সত্যিই যে যুগে বাপেরা স্বপ্ন দেখতেন ছেলেরা আই. সি. এস. হবে, মায়েরা কল্পনা করতেন মেয়েরা পাবে ত্র্যক্ষরধারীপতি, বামভুলে শিব ভোলানাথ নয়। তাই ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষের কামনা ছিল 'অরো' বা শ্রীঅরবিন্দ হবেন একটা জাঁদরেল গোছের আই. সি. এস. অফিসার। বাঙালী সমাজ, বাঙালী চিন্তাধারা, ভারতীয় হাবভাব থেকে তাঁকে বিচ্যুত করে দার্জিলিংএ কনভেণ্টে পড়িয়ে সাতবছর বয়সে তাঁকে তিনি বিলাতে রেখে এলেন। কিন্তু চোদ্দ বছর পরে যে মানুষটা আই. সি. এস. না হয়ে ফিরে এলো, বম্বের এপোলো বন্দরে দেশের মাটিতে পা দিয়ে সে কী দেখলে, না, একটা ভূমাময়ী অচঞ্চলা ভারতবর্ষের ছবি, ভোগভূমির নয়। তার মন আনন্দে ভরে উঠলো, শান্ত স্তব্ধ সমাহিত হলো। একে কী বলবো? অন্য পরিবেশে মানুষ হয়ে যাঁর বাংলা না জানার কথা, যিনি নিজে ইংরাজী ছাড়া কিছু লিখতেন না, তিনি কেমন করে লিখলেন—বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের কথা, মধুসূদনের কাহিনী। তখনি শ্রীঅরবিন্দের কম্বুকণ্ঠে শুনি—**Let Bengal be true to her own soul.**

শ্রীঅরবিন্দকে বাল্যে যে কয়দিন এদেশে কাটাতে হয়েছিল সেই কয়দিন তাঁকে আই. সি. এস. এর মহামহিমময় ভবিষ্যতের জন্য তৈয়ারী করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ। তাঁরা তিনভাই (বিনয়ভূষণ ও মনোমোহন—পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক ও কবি) পড়লেন ইংরাজী স্কুলে, দার্জিলিংএর লরেটো কনভেণ্টে। মাত্র সাত বছর বয়সেই শ্রীঅরবিন্দকে পাঠানো হলো 'হোমে' বা বিলাতে, যাতে তিনি উপযুক্ত আবহাওয়ায় বর্ধিত হয়ে সুশিক্ষা লাভ করেন। চৌদ্দবছর ধরে তিনি বিলাতে রইলেন—ম্যাঞ্চেষ্টারের গ্রামার স্কুল থেকে লণ্ডনের সেণ্টপলস্, সেণ্টপলস্ থেকে কেম্‌ব্রিজের কিংস কলেজ—আই. সি. এস. পরীক্ষা দিলেন, লোভনীয় চাকরীর আশ্বাস পেলেন, কিন্তু রঙিন হাতিয়ার হাতে নকল ঘোড়-সওয়ার হওয়া হলোনা তাঁর, কারণ তিনি দিলেন না ঐ ঘোড়া চড়ার পরীক্ষা। হায় হায় করে উঠলো সেদিনের তরুণ নওজোয়ানরা, অলক্ষ্যে আকাশ-পথে আর-এক জয়ের মালা হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন ভাগ্যলক্ষ্মী। এতে তাঁর পিতার মনে যে কী নিদারুণ আঘাত লেগেছিল তা যাঁরা তাঁদের পারিবারিক ইতিহাস শুনেছেন তাঁরাই জানেন—অনেকে বলেন এই শোকেই শ্রীঅরবিন্দের পিতার দেহান্তর হয়।

॥ ছয় ॥

শ্রীঅরবিন্দ ভারতে ফিরে এলেন ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে, বরোদায় চাকরী নিয়ে। তখন তিনি তরুণ যুবক—তিনি নিজেই বলেছেন যে ভারতের মাটিতে পা দিয়েই তাঁর মনে এক অদ্ভুত ভাবান্তর উপস্থিত হয়—এক ভূমাময়ী অচঞ্চলা যেন দিগন্তরে অঞ্চল বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছেন। এর সূচনা আমরা দেখতে পাই ইংলণ্ডে থাকা কালে চৌদ্দবছর

বয়সেই। অনেকেই জানেন না যে শ্রীঅরবিন্দ শুধু মহাযোগী নন, স্বদেশপ্রেমিক নন্, বড় কবিও। অবশ্য তিনি লিখতেন ইংরাজীতে এবং সে-ইংরাজীর ভাষা গ্রীকোলাতিন ভাবের সমবায়ে ক্লাসিকাল গুরুগম্ভীর ভাষা। তাঁর কবিজীবনের সূত্রপাত বাল্যকালেই। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে সেণ্টপলস্ বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণী সভায় Wordsworth এর To the Cuckoo আবৃত্তি করে এসে তিনি সেই রাত্রেই নিজে এক কবিতা লিখলেন যার প্রথম চরণ হোল—Sounds of the awakening world—পৃথিবী জাগচে, ঘুম ভাঙচে, তারই পদধ্বনি কিশোর কবি শুনছেন কোকিলের ডাকে। সেইদিন থেকে আরম্ভ করে তাঁর মহাপ্রয়াণের দিন পর্যন্ত তিনি একটানা কবিতা লিখে চললেন। তাঁর ভাবে ভাষায় ঝংকারে বর্ণ-বৈচিত্র্যে উপমায় শুধু যে তথ্য ও তত্ত্বেরই সমাবেশ দেখি তা নয় একটা আন্তর অনুভূতির স্পর্শ পাই। কোকিলের ডাকে যে বালক-কবি জেগেছিল, সারা-জীবনের সাধনার পর সেই চিরতরুণ কবিই অমেয় আশার বাণী শুনিয়ে গেলেন, সাধকের অসংশয়িত কণ্ঠে "And in her bosom nursed a greater dawn".

বরোদাবাসের চৌদ্দ বৎসর তাঁর কাছে বাণীসাধনার যুগ—তিনি পড়ছেন, তিনি বুঝছেন—বেদবেদান্ত তন্ত্র, উপনিষদ গীতা, পুরাণ, ইংরাজী সংস্কৃত বাংলা, ফরাসী গ্রীক লাতিন, তিনি লিখে চলেছেন কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ—অন্তরে ধ্যানের নির্দেশ পাচ্ছেন। একটি উদাহরণ দিই। বঙ্কিমচন্দ্র মারা যান ১৮৯৪ সালের এপ্রিলে। একুশ বছরের যুবক অরবিন্দ, যাঁর চৌদ্দ বছর কেটেছে বিলাতে শুধু ইউরোপীয় সাহিত্যচর্চায়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে যাঁর মোটেই পরিচয় হয়নি, তিনি বঙ্কিমপ্রয়াণের তিনমাসের মধ্যেই বঙ্কিম সাহিত্য ও সাধনা সম্বন্ধে যে গভীর, সুষ্ঠু ও সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা করলেন তাতে সত্যই আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয় তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও রসবোধ দেখে।

লোকের ধারণা যে শ্রীঅরবিন্দ বাংলা জানতেন না, কিন্তু মূল বাংলা না পড়লে এই সমালোচনাগুলি এতো সুন্দর হোত না। সমালোচনা সাহিত্যে এই সাতটি প্রবন্ধ আজও জ্বলজ্বল করছে। আবার তিনি কশাঘাত করলেন তখনকার দিনের কংগ্রেসকে সাতটি প্রবন্ধে— সেদিনের আবেদন-নিবেদনের ম্লান দীপের মালাকে কেটে খান্-খান্ করলেন। প্রবন্ধগুলির নাম—New Lamps for the Old— পুরাতন প্রদীপের বদলে জ্বেলে দাও নবদীপালি মালা। এই সময়েই তিনি মার্তিলার গান, উর্বশী, 'প্রেম ও মৃত্যু', 'পার্সিউস দি ডেলিভারার, প্রভৃতি লেখেন।

১৯০৬ সালে শ্রীঅরবিন্দ কলকাতায় ফিরলেন—জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের (যাদবপুরের) প্রিন্সিপ্যাল হয়ে। সারাদেশ বেয়ে এক ঝোড়ো হাওয়া বয়ে চলেছে বাংলাকে খণ্ডিত করা নিয়ে। বাংলার মাটি, বাংলার জল ধন্য হোক্, পুণ্য হোক, কবি সেই গান গাইছেন, রাজনীতিকরা জোর গলায় মিটিং করছেন, বয়কট্ করছেন—চতুর্দিকে এক নতুন উন্মাদনা, এক জনজাগরণ—পূবে বিশাল বরিশালে কুলিশবাহী পুলিশের অত্যাচারে বাংলার মন সন্ত্রস্ত। এমনি দিনেই এলেন শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় ফিরে—এ তো আসা নয়, এ হলো আবির্ভাব। চার বছর তিনি কলকাতায় ছিলেন—সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম, যুগান্তর, কর্মযোগী নিয়ে, সাদাসিদে সাধারণ মানুষ, আঠারো ঘণ্টা করে দিনে খেটেও যিনি ক্লান্ত নন্, সারাদিন লিখেও যিনি অবসন্ন নন্, যিনি লোককে কথার ভোজবাজীতে শুধু চমকিয়ে দেননি, তিনি নিজেই ছিলেন কর্মযোগীর এক বিরাট প্রতীক্।

॥ সাত ॥

বঙ্কিমের মহাপ্রয়াণ হলো ১৮৯৪ সালের এপ্রিল মাসে। শ্রীঅরবিন্দ তখন ২১।২২ বৎসরের যুবক, সবে বিলাত হতে ফিরেছেন। তখন তিনি বরোদায়, বসেছেন বাণীর সাধনায়, অন্তরের ধ্যানের নির্দেশে। সেদিনের এই তরুণ তাপস, যিনি নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন বৃহত্তম পরিণতির জন্য, গভীরতম অনুভূতির জন্য, তিনি দেখলেন বঙ্কিমের অন্তর্নিহিত মন্ত্রদৃষ্টিকে—অসংশয়িত চিত্তে স্বীকার করে নিলেন বন্দেমাতরমের ঋষিকে।

কবি শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন—হে বঙ্গ জননী, কাঁদো কাঁদো

Thy tears fall fast......

The golden light, the fragrance heaven rears,
The fragrance and the light for ever shed
Upon his lips immortal who is dead.

বঙ্কিমের ওষ্ঠাধর আজ নীরব বটে, নীরব তাঁর রবাব বীণা, কিন্তু স্বর্গের সৌরভ আর অম্লান দ্যুতি পড়েছে তার উপর।

আবার তিনি লিখলেন—

How hast, *thou lost, O month of honey and flowers,*
The voice that was thy soul.

হে মধুমাস, তুমি কেমন করে হারালে সেই মধুময় বাণীর স্রোতাকে যা তোমার আত্মারই প্রতীক্।

He changed at will and made soul moving books
From hearts of men and women's honied looks.

স্ত্রীলোকদের মধুময় দৃষ্টি আর অন্তরময় পুরুষদের হৃদয় থেকে রসবস্তু আহরণ করে বঙ্কিম পাত্রপাত্রীদের গড়লেন, আত্মামাতানো বই লিখলেন। তরুণ মনের উচ্ছ্বাসে শ্রীঅরবিন্দ এই বঙ্কিম-প্রশস্তি গাইলেন।

O plains, O hills, O rivers of Sweet Bengal,
O land of love and flowers, the spring-bird's call

* * * *

Your heart was this man's heart. Subtly he knew
The beauty and divinity in you.

হে আমার মধুর বাংলার শ্যামবনানী নদীগিরিকন্দর ফুলের দেশ, প্রেমের দেশ, জাগ্রত বসন্তের বার্তাবহের দেশ, তোমার অন্তরের গূঢ় কথাটি বঙ্কিম আহরণ করেছিলেন, তিনি জেনেছিলেন তোমার সৌন্দর্য ও দেবত্বের বিভূতি—

শুধু কবিতা দিয়েই বঙ্কিম-তর্পণ তিনি করলেন না। পূর্বেই বলেছি বঙ্কিমপ্রয়াণের তিনমাসের মধ্যেই তিনি বঙ্কিমসাহিত্য ও সাধনা সম্বন্ধে গভীর, সুষ্ঠু ও সুযুক্তিপূর্ণ সমালোচনা করলেন। এই প্রবন্ধগুলি ইংরাজীতে লেখা হলেও তার প্রতি ছত্রে প্রমাণ রয়েছে যে মূল বাংলা না পড়লে এই রসবিচার এতো সুন্দর হোত না। বঙ্কিমমানস সম্বন্ধে বহু গবেষণা হয়েছে, বহু বিদগ্ধ আলোচনা হয়েছে, কিন্তু ৬৫ বৎসর পূর্বের শ্রীঅরবিন্দের তরুণ বয়সের আলোচনা মাঝে মাঝে তীব্র হলেও আজও প্রামাণিক ও বিচারসহ।

সাতটি প্রবন্ধ তিনি লিখলেন—প্রতি সপ্তাহে একটি—বঙ্কিমের মৃত্যুর তিন মাসের মধ্যেই এর আরম্ভ।

(১) Youth and College Life—১৮৯৪ সালের ১৬ই জুলাই
(২) The Bengal He lived in „ ২৩শে জুলাই
(৩) His Official Career „ ৩০শে জুলাই
(৪) His versatility „ ৬ই আগস্ট

(৫) His Literary History ১৮৯৪ সালের ১৩ই আগস্ট
(৬) What He did for Bengal ,, ২০শে আগস্ট
(৭) Our hope in the future ,, ২৭শে আগস্ট

সাতটি প্রবন্ধের বিষয়-নির্বাচনেই দেখা যাবে যে, শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমের সাহিত্যসৃষ্টি, তাঁর কবিমানস, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, তখনকার দিনের সমাজের কথা, বহুমুখীপ্রবণতা ও আমাদের অনাগতদিনের আশার কথা নিয়ে আলোচনা করেছেন—সবচেয়ে উদাত্তসুরে যা তিনি বলেছেন তা হচ্চে বঙ্কিম কি আশার বাণী নিয়ে এসেছিলেন ও কি মৃতুঞ্জয়ী মন্ত্র দিয়ে গেলেন। বঙ্কিম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলিতে তিনি শুধু বঙ্কিমকেই দেখলেন না, বঙ্কিম যে যুগে, যে মাটিতে, যে বীজে জন্মগ্রহণ করেছেন তাদেরও বিশ্লেষণ করলেন—সে-বিশ্লেষণ ঘটনাপঞ্জীর বিশ্লেষণ নয়, ভাববিশ্লেষণও বটে। উনবিংশ শতাব্দীর বিরাট পরিধিতে শুধু তখনকার দিনের সামাজিক পরিস্থিতি, গ্রাম্য আবেষ্টনীই স্থান পেলো না, নবজাগরণের নূতন ব্যাখ্যা তিনি করলেন। প্রতীচীর জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, মানবতা বোধ, সেবার আদর্শ কেমন করে শিক্ষিত মনকে চঞ্চল করেছে তার কথা বললেন; তখনকার সেই যজ্ঞের ঋত্বিকদের—রামমোহন, রাজনারায়ণ, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল, মধুসূদন, তরু দত্ত প্রভৃতির সম্যক্ আলোচনা করলেন। কেশব সেন ও কৃষ্ণদাস পালকে কিন্তু তিনি মোটেই আমল দিলেন না। রামমোহন সম্বন্ধে তিনি অপেক্ষাকৃত নীরব ও কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি অপেক্ষাকৃত উদাসীন ছিলেন, একথা মনে হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। শ্রীঅরবিন্দ যৌবনে অত্যন্ত কঠিন সমালোচক ছিলেন—তীব্র ভাষায় তীব্র চিন্তার প্রকাশ পেতো। এর কারণ কাহাকেও "নস্যাৎ" করবার ভাব নয়—এ হচ্ছে একটা আদর্শের প্রতি উৎকট অনুরাগ এবং সে-আদর্শ দেশমাতার প্রতি অনুরাগ, বিজাতীয়তার পরিহার। ব্রাহ্মধর্মের eclecticism এর দিকটা, পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে সমাজসেবার আদর্শ,

কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের নীতি, তাঁর উগ্র মনকে নমনীয় করেনি। বরং এই সময়ে ইন্দুপ্রকাশে প্রকাশিত New Lamps for the Old প্রবন্ধগুলিতে তিনি এই মনোভাবকে দৈন্যপীড়িত, আদর্শবর্জিত বলে তীব্র কশাঘাত করেছেন। মনে রাখতে হবে তখন তাঁর কবি-কল্পনায় খেলছে Perseus the Deliverer-এর মত এক বিরাট ত্রাণকর্তাকে, যে দেবতাকেও স্বাধীন করতে পারে, যে মানুষকে তুলে ধরতে পারে ঊর্ধ্বে, আরো ঊর্ধ্বে, সব দিক দিয়ে—

Till her dim soul awakes into the light.

তাই বঙ্কিমের বন্দেমাতরম্ তাঁর কাছে দেবতার আশীর্বাদের মতই প্রতিভাত হয়েছিল। বঙ্কিমের বহুমুখী প্রতিভাকে বিশ্লেষণ করে তিনি নব্যবাংলার গূঢ়তম রূপটিকে আবিষ্কার করতে চাইলেন—শিল্পীর চোখ দিয়ে বঙ্কিম ও মধুসূদনকে তিনি নূতন করে দেখলেন—একজন আনলেন গদ্যের নূতন রীতি, আর একজন দিলেন পদ্যে নূতন ছন্দ—গৌড়জনকে তাঁরা মধুপান করালেন। বঙ্কিম নিজেই মধুসূদন সম্বন্ধে বলেছিলেন—জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও, তাহাতে নাম লেখো শ্রীমধুসূদন।

শ্রীঅরবিন্দ মধুসূদন সম্বন্ধে লিখলেন—

Poet who first with skill inspired did teach
Greatness to our divine Bengali speech

নব বাংলার আদিম কবি বলে তিনি তাকে অভ্যর্থনা করলেন—

The God himself of the enchanting flute
The God himself took up his pen and wrote

কবির লেখনী দিয়ে সেই বংশীধারী বিচিত্র দেবতাই এই অপূর্ব কাব্য মধুসূদনকে দিয়ে লিখিয়েছেন। মধুসূদনের কথায় তিনি লিখলেন—

'As we read the passage of that titanic per-

sonality over a world too small for it, we seem to be listening again to the thunder scenes in Lear or to some tragic piece out of Thycidides or Gibbon narrating the fall of majestic nations or the ruin of mighty kings. No sensitive man can read it without being shaken to the very heart. তিনি বললেন যে কোন চিন্তাশীল মানুষই এ সব পড়ে মনে মনে নাড়া না খেয়ে থাকতে পারে না। বঙ্কিম সম্বন্ধে একথাও তিনি বললেন যে বিদ্যাসাগরী ডিক্টেটরশিপের নাগপাশ ভেদ করে বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যে নতুন হাতিয়ার দিলেন।

অবশ্য বঙ্কিমের অনুপ্রেরণার মূলে আগস্ট কোমতের নিরীশ্বরবাদ, মানবপূজা, সমাজসেবার আদর্শ যে অনেকখানি জুড়েছিল, সে কথা আজ সর্ববাদীসম্মত। অনেকেই মনে করেন যে তাঁর অনুশীলনতত্ত্ব, দেবী চৌধুরাণী, আনন্দমঠের তথ্য অনেকটা কোমতের মতো। তাঁর কৃষ্ণচরিত্রকেও অনেকে সেই মতাবিষ্ট বলেন। শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন —The clear serenity of the man showed itself in his refusal to admit asceticism among the essentials of religion.--মধ্যযুগের খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে রিক্ত শুষ্ক করাই চরিতার্থতা বলেননি-- একথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে যখন তাঁকে তিনি দেখেছিলেন দ্বিতীয় তপস্যার আসনে অপ্রগলভ স্তব্ধতায়। আবার এই কথাই শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন বঙ্কিম সম্বন্ধে।

The Bengal He lived in প্রবন্ধে আমরা সদ্য ইংলণ্ড থেকে প্রত্যাগত উচ্চশিক্ষিত তরুণ শ্রীঅরবিন্দের যে মানসিক সৌন্দর্য ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাই তাতে অভিভূত হয়ে যেতে হয়—গত শতাব্দীর পঞ্চম ষষ্ঠ দশকের সমাজকে তিনি অভিহিত করলেন এই বলে—A society electric with thought and loaded to the brim with passion—বাংলার নবজাগরণ যেন তাড়িত

চৌম্বক শক্তির মত, যার আকর্ষণ দুর্নিবার—সেখানে নূতন প্রেরণা আছে, সে-প্রেরণায় উচ্ছ্বাস আছে, সে-উচ্ছ্বাসে বহু অনাবশ্যক ফেনা জমেছে একথা সত্য, কিন্তু তার মধ্যে আছে বেগ ও আবেগ—সেই pagan abandon এর মধ্যে ছিল শক্তি, উন্মাদনা, যা জাগায় উদ্বুদ্ধ করে, শুধু তাকে সংহত সংযমিত করে নিতে হয়—যেমন বন্যার জল পলিমাটি দিয়ে দেশকে উর্বর করে তোলে। তিনি এই যুগকে দেখলেন—A miniature renaissance এর যুগ হিসাবে—পুনরভ্যুত্থান হচ্ছে কিন্তু তার পরিধি স্বল্প, তার বিকাশের রঙ্গভূমি সীমা-নিবদ্ধ। তিনি লিখলেন—"From this meeting of a foreign art and civilisation with a temperament differing from the temperament which created them, there issues, as there usually does issue from such meeting, an original art and an original civilisation. Originality does not lie in rejecting outside influences but in accepting them as new mould into which our own individuality may run. This is what happened in Bengal.

বাঙালী এক নতুন শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতা শিল্পকলার সংস্পর্শে এলো—এই মিলনের ফলে তার চেতনারাজ্যে এলো এক নূতন স্রোত, গড়ে উঠলো যা, তাকে শুধু অনুকরণ বলা চলে না, মৌলিকও—কারণ মৌলিকত্বে বাইরের প্রভাব থাকবে না তা নয়, কিন্তু নিজের বৈশিষ্ট্যে তাকে রূপান্তরিত করে নিতে হবে এবং সেইটাই হবে তার নিজস্ব। বাংলায় এই রসায়নই ঘটেছিল।

লোকের মনে যখন এমন একটা ধারণা এসে গিয়েছিল যে ইংরাজীর সব কিছুই ভাল, বাংলার সব কিছুই খারাপ, তখন বঙ্কিম আর মধুসূদনই তাকে বাঁচিয়ে দিলেন অপমৃত্যুর হাত হতে। বঙ্কিম সম্বন্ধে তাঁর শেষ কথা হলো—

"And when posterity comes to crown with her praises the Makers of India, she will place her most splendid laurel not on the sweating temples of a place-hunting politician nor on the narrow forehead of a noisy social reformer but on the serene brow of that gracious Bengali, who never clamoured for places or power but did his work in silence for love of his work, even as nature does, and just because he had no aim but to give out the best that was in him, was able to create a language, a literature and a nation.

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন স্থিতধী সেদিনকার সেই অখ্যাতনামা তরুণের সত্যদর্শন ভাবীকাল সাদরেই বরণ করে নিয়েছিলো। পদলোলুপ রাজনৈতিককে বা বাক্যবাগীশ সংস্কারকের গলায় সে বরমাল্য দেয়নি—অনাগত মহাকাল তাঁকেই বরণ করেছে যিনি নিঃশব্দে লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে কাজ করে গেছেন, নিজের অন্তরের শ্রেষ্ঠ রত্নগুলিকে সবার জন্য বিলিয়ে দিয়ে গেছেন—যে স্রষ্টা সৃষ্টি করে গেলেন একটা ভাষা, একটা সাহিত্য, একটা জাতিকে।

সেদিনের তরুণ অরবিন্দ এই বলেই প্রণাম জানালেন প্রবীণ বঙ্কিমকে। বঙ্কিম তাঁর কাছে ঋষি—বন্দেমাতরম্, মন্ত্র। এরই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ১৯০৭ সালে বন্দেমাতরমে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বললেন—The Rishi is different from the Saint. His life may not have been distinguished by superior holiness nor his character by an ideal beauty. He is not great by what he was himself but by what he has expressed. A great and vivifying message had to be given to a nation or to humanity; and God has chosen this mouth on which to shape the words of the message. A momentous

vision had to be revealed ; and it is his eyes which the Almighty first unseals.'

তাই বঙ্কিম মন্ত্রদ্রষ্টা, জাতির স্রষ্টা ত বটেই ; আর তার চেয়েও বড় কথা যে তিনি মাকে বসালেন আমাদের মনে, ভবানীর মন্দিরে, দেশ-মাতৃকার পাদপীঠে।

"The third and Supreme Service of Bankim to his nation was that he gave us the vision of Our Mother." এটা একটা "bare intellectual idea' নয়, 'the mere recognition of the desirability of freedom' নয়, এ হচ্ছে একটা জাতির অন্তরমন্থিত তুর্য্যনাদের প্রতীক-- স্বদেশপ্রীতির জীবন্ত মন্ত্র। The Mother had revealed herself—মা যেখানে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা যে মাতা, বাহুতে যার শক্তি, হৃদয়ে ভক্তি।

আর এক মহাকবির ভাষায়—

ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ
তোর তুই নয়নে স্নেহের হাসি ললাটনেত্র আগুন বরণ।

তাইতো তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে বলতে পারলেন—

নব্য বাংলা বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের কাছেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির পাঠ নেবে। আজও সত্যদ্রষ্টা সাধকের সেই বাণী সত্য। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের কথা—তখনকার প্রাচীনরা বঙ্কিমের রচনাকে সসম্মান আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করেন নি। বঙ্গভাষা বা সাহিত্যকে বঙ্কিম বাল্য থেকে যৌবনে নিয়ে গেলেন, তাতে শক্তি সঞ্চার করলেন, সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে দিলেন, গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ লিখে তার রসসাহিত্যকে নূতন করে গড়ে তুললেন, ভাষার নিপুণ কর্মকার তিনি, চরিত্র অঙ্কনে সুপটু। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, বঙ্কিম ছিলেন সাহিত্যে কর্মযোগী। তাঁর কল্পনা ছিল, কিন্তু কাল্পনিকতা ছিল না। উদ্দাম ভাবের আবেগে কল্পনা কোথাও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ছুটে যায় নি।

এ বঙ্গের চিত্তক্ষেত্রে চলিতেছে সম্মুখের টানে,
নিত্য নব প্রত্যাশায় ফলবান ভবিষ্যতের পানে।

বঙ্কিমে এই ফলবান ভবিষ্যতকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, আর শ্রীঅরবিন্দ দেখেছিলেন সেই ভবিষ্যতের মন্ত্রকে আর তার হোতাকে।

॥ আট ॥

বঙ্কিমী কীর্তির কথা বলতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ মধুসূদনের সম্বন্ধেও অতিপ্রশস্তির ভাষা প্রয়োগ করেছেন। তবে তাঁর আলোচনা বিচার-সহ ও সুষ্ঠু। শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথা শ্রীযুক্ত পশুপতি ভট্টাচার্যের অনুবাদেই তুলে দিইঃ "বাংলা ভাষার সুরটি যদিও মধুর ও মনোরম ছিল, কিন্তু তা ছিল যেন একতারা যন্ত্রের একটানা সুরের মত। শুধু প্রাচীন কবি ভারতচন্দ্র ছাড়া অন্য কোন প্রতিভাশালী ওস্তাদ এ যন্ত্র নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া করেননি · গদ্য সাহিত্যের মধ্যে কেবল বেতাল-পঞ্চবিংশতি ও বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান ছাড়া বিশেষ কোন উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ ছিল না, আর বাংলা কাব্যগুলিরও মধ্যে সেই একটানা মাধুর্যরস ছাড়া আর বিশেষ কিছুই মিলত না। পৌরুষের দৃঢ়তা, সূক্ষ্মতা, প্রসারতা, বিচিত্রতা এ সব কিছুই তার মধ্যে মিলত না। তার পরে দেখা দিলেন মধুসূদন ও বঙ্কিম, গ্রীককবি টারপেণ্ডার এবং অর্ফিউসের মতো অবতীর্ণ হয়ে তাঁরা সেই একতারা যন্ত্রটিতে বাঁধলেন নতুন নতুন তন্ত্রী। যে ভাষা ছিল এককালে নুয়েপড়া ধরনের নারীভাষা, মধুসূদনের হাতে তাই হয়ে উঠল এক তেজদৃপ্ত দেবভাষা, তাই হ'ল বীরত্বব্যঞ্জক মহাকাব্যের ভাষা, যাকে মাধ্যম করে দুর্দাম ঝড়ঝঞ্ঝাও নিজেদের বক্তব্যগুলি বজ্রনিনাদে ব'লে যেতে পারে; সমুদ্রগর্জনের অনুকরণে এই ভাষাতেও তিনি পরমাশ্চর্য বাগ্‌বিন্যাস করে সকলকে চমৎকৃত করতে থাকলেন।"

শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করলেন যে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত ও অন্যান্য সাহিত্যিকরা বাংলা সাহিত্যকে উচ্চ আদর্শের পথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন। "কিন্তু বিদ্যাসাগর যতই জ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী হোন্ তিনি শিল্পী ছিলেন না; অক্ষয়কুমার দত্ত যা কিছু লিখতেন তা কেবল তাঁর সাময়িক পত্রিকার পাঠকদের কাছেই আদর পেত; বাকি সকলের প্রকৃত সাহিত্যিক মৌলিকতা বিশেষ কিছু ছিল না। ভাষাকে প্রাণ দিতে ও তার রূপান্তর আনতে হলে যাদুকরের মতো একটা যে সহজাত শক্তি থাকা দরকার, সেই শক্তি এঁদের কারুরই মধ্যে ছিল না।"

এই শক্তি ছিল বঙ্কিমের, মধুসূদনের, রবীন্দ্রনাথের, শরৎচন্দ্রের। তাই যখন মধুসূদনের কাব্যগ্রন্থগুলি বেরুলো "তখন দেশে এমন এক সাড়া পড়ে গেল, যার সঙ্গে তুলনা করা যায় এলিজাবেথীয় যুগের ইংলণ্ডে মার্লো কর্তৃক রচিত *Tamburlainc* নামক নাটকটি প্রকাশিত হওয়াতে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ফ্রান্সে হিউগো কর্তৃক *Hernani* নামক নাটকটি প্রকাশিত হওয়াতে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয় তারই সঙ্গে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা কাব্যালোচনায় অবান্তর হলেও উল্লেখ-যোগ্য। অনেকের মনে ভ্রান্ত ধারণা আছে যে শ্রীঅরবিন্দ এবং তাঁর দেখাদেখি তাঁর ভক্ত ভাবক অনুরাগী শিষ্যশিষ্যারা ভারতের অন্য কোন মহাপুরুষ বা মনীষীকে আমল দেননি বা দিতে চান না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে মধুসূদন বঙ্কিম এবং তখনকার দিনের তরুণ রবীন্দ্রনাথ আরো তরুণ অরবিন্দের কাছে যে উদার প্রশস্তি পেয়েছিলেন, সে-কথা পূর্বেই বলেছি। রামমোহন সম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন, এবং দয়ানন্দ, রাজনারায়ণ ও দেবেন্দ্রনাথকে তিনি উচ্চে স্থান দিয়াছেন, এ অভিযোগও আছে। ১৮৯৪ সালে তিনি যে কথাই লিখুন, ১৯১৫ সালে আরো পরিণত বয়সে দয়ানন্দের প্রসঙ্গে রামমোহন সম্বন্ধে তিনি লিখলেন

"Rammohan Roy, that other great soul and puissant worker who laid his hand on Bengal and shook her—to what mighty issues—out of her long and indolent sleep." রামমোহন যে ঘুমন্ত বাঙালীকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছিলেন, এ কথা অস্বীকার করবে কে ?

মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে সম্বন্ধে প্রথমে তিনি তীব্র সমালোচক হলেও একথা স্বীকার করেছিলেন—'What would Maharastra of today have been without Mahadev Govinda Ranade and what would India of today be without Maharastra.' তিলক দয়ানন্দ বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁর মন প্রশস্তিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতো, এ কথা সকলেই জানেন। সাধনার ক্ষেত্রেও স্বামিজীর কাছে তিনি ঋণী, একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন—"We perceive his influence still working gigantically, we know not well how, we know not well where, in something that is not yet formed, something leonine, grand, intuitive, upheaving that has entered the soul of India." পরমহংসদেব সম্বন্ধে তিনি এতোই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে অনেক সময় অত্যুৎসাহী ভক্তদের বলতে বাধ্য হয়েছেন, ভৎসনা করেছেন যে তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে বোঝেন না। তিনি "spiritual pigmy" নন বরং "a colossal spiritual capacity"—যিনি বারে বারে বিভিন্ন যোগের পথ দিয়ে সেই পরম ঐক্যেই মতেই উপনীত হয়েছেন, "extracting substance out of it with an incredible rapidity, always to return to the heart of the whole matter."

শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, শংকর, চৈতন্য, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ ও শ্রীঅরবিন্দের যোগ সম্বন্ধে অনেক সময়ে তুলনামূলক উক্তি হয়। তিনি নিজেই বলছেন, "I shall not be surprised or perturbed if one day I am reported to have declared, on the

authority of 'advanced' or 'unadvanced' Sadhaks, that Buddha was a 'poseur' or that Shakespeare an overrated poetaster or Newton a third rate College Don without any genius. In this world all is possible. Is it necessary for me to say that I have never thought and cannot have said anything of the kind, since I have at least some faint sense of spiritual values ?"

॥ নয় ॥

সাধারণ পাঠকপাঠিকার পক্ষে শ্রীঅরবিন্দের কাব্য বোঝবার কয়েকটি বিশেষ বাধা আছে...

প্রথমতঃ, শ্রীঅরবিন্দের কাব্য ও কবিতাগুলি বেশীর ভাগই ইংরাজীতে লেখা (কিছু ফরাসী প্রভৃতি অন্য ভাষাতেও আছে) এবং সে ইংরাজী, সে বাচনভঙ্গি, সে রচনাশৈলী শুধু ক্লাসিকাল নয়, বহুল প্রকারে ইউরোপীয় সাহিত্য, বিশেষ করে গ্রীকোলাতিন সাহিত্যের পরিবেশ, পরিভাষা ও পরিচয়ের দ্বারা প্রভাবিত। আরো একটা কথা এই যে, সে ভাষণরীতি আজকের দিনে একটু archaic বা পুরাতনী হয়ে আসছে। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে— বিশ্বসাহিত্যে এর স্থান কোথায়, ইংরাজী সাহিত্য শ্রীঅরবিন্দ সাহিত্যকে গ্রহণ করেছে কি না। মধুসূদনের 'Captive lady' বা বঙ্কিমের 'Rajmohan's wife' (উপন্যাস) সেকালের ইংরাজী সাহিত্যে স্থান পায়নি, একথা সুবিদিত। অরু-তরুর সুন্দর কবিতাগুলিও Anglo-Indian Literature-এর এককোণে পড়ে আছে, একথাও সবাই জানেন। শ্রীঅরবিন্দ যখন ইংরাজীতে কবিতা লিখতে সুরু করলেন

তখন তাঁরই বড় ভাই কবি মনোমোহন ঘোষ, Laurence Binyon, Stephen Phillips ও Arthur Cripps-এর সহযোগী হয়ে একসাথে কাব্যচর্চা আরম্ভ করেছেন। সেযুগে 'Prima Vera' নামে এদের সম্মিলিত একটি কবিতার পুস্তকও বিশেষ প্রশংসা পেয়েছিল। এর পরেও বহু ভারতীয় মনীষী ইংরাজী ভাষায় মনের আবেগকে ছন্দোবদ্ধ করে কবিতা লিখেছেন, অপরূপ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন কিন্তু রক্ষণশীল ইংরাজ সাহিত্যসমাজ তাকে অপাংক্তেয় করে না রাখলেও সাহিত্যের অন্দরমহলে স্থান দেয়নি। ডিরোজিও, রিচার্ডসনের যুগ থেকে রাজনারায়ণ বসু, মধুসূদন, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, অরু-তরু, মনোমোহন, রবীন্দ্রনাথ, সরোজিনী নাইডু, ব্রজেন শীল, ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এছাড়া অন্যদিকেও বিবেকানন্দ অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথের পরে জওহরলাল, রাধাকৃষ্ণন্, কৃষ্ণমূর্তি, মুলুকরাজ আনন্দ প্রভৃতির কিছু সাহিত্যিক খ্যাতি আছে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা আবশ্যক, ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বিংশশতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যের নানাদিক দিয়ে প্রভেদ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজের সারা বিশ্বে জোর দব্‌দবা, তাদের প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য, প্রচণ্ড তাদের শাসন, বিরাট তাদের বোল-বোলা। যেন জ্বলন্ত খসবুওয়ালা খাঁটি ঘিয়ের কড়ায় ফুটন্ত বুদ্বুদে, অর্থ, আভিজাত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ফুটছে টগবগ্ করে। সেই সময়ে ইংরাজ যে অন্যদেশের সাহিত্যিকের সৃষ্টিকে নিজের ঘরে স্বীকার করে নেবে, এটা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য ছিল অনেকের কাছে। এমনকি, নোবেল প্রাইজ পাবার পর রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যিক হিসাবে ছাড়পত্র পাওয়া সত্ত্বেও ইংরাজী সাহিত্যের আমদরবারে তাঁর যে কোন বিশেষ স্থান ছিল তা মনে হয় না। এরনসন কর্তৃক উদ্ধৃত লিভারপুল পোস্টের একটি মন্তব্যে পড়ি—"We of the West do not want from the East poetic edifices built upon a foundation of

Yeats and Shelley and Walt Whitman. We want to hear the flute of Krishna as Radha heard it, to fall under the spell of the blue God in the lotus-heart of dream. This is of course those of us interested enough in Indian poetry not to be disgusted by its disparagement of selfhood."

"পশ্চিমের আমরা ইয়েটস, শেলী, ওয়াল্টহুইটম্যানের ভিত্তিতে কাব্যসৃষ্টির সৌধগঠন চাই না—আমরা চাই শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুনতে রাধা যেমন শুনেছিলেন, সেই-স্বপন সায়রের কমলবনে ঘনশ্যাম দেবতার মোহজালে পড়তে, অবশ্য যাঁরা ভারতীয় কাব্যের আত্মতত্ত্বের কচকচি সহ্য করতে পারেন।" সতেরো বছর পরে ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ডমেল বললেন—"For Tagore's first concern is with God, a God whom the East has never for a moment lost sight of. So there is a connection in his approach, a spontaneity in his devotion. But for a long time now our own poets have been on a different road. We simply have not the nerve now-a days to write mystical verse to start a poem, "Thou art the sky and thou art also the nest, O Thou Beautiful !"

রবীন্দ্রকাব্যে ভগবান পাতা জুড়ে বসে আছেন, আজকের কবির কাছে ওসব অচল—আজকের দিনের কোন কবি আধ্যাত্মিক সুরে কবিতা আরম্ভ করতে সাহস করবে না, বলতে পারবে না যে তুমিই আকাশ, তুমিই গৃহ—ওগো তুমি সুন্দর !—

রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধে এই সমালোচনা যদি প্রযোজ্য হয়, অরবিন্দ-কাব্য সম্পর্কে এই সব উক্তি আরো তীক্ষ্ণভাবে প্রযোজ্য—তাঁর কবি-মানসে একটা মিস্টিক্ চেতনা সব সময়েই কাজ করে চলেছে এবং তাঁর ভাব ও ভাষা গুরুগম্ভীর। অনেককেই বলতে শুনেছি যে, অরবিন্দ-কাব্য সাধারণের জন্য নয়।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা সমীচীন হতে পারে যে, ব্রিটেনের বাইরে যে বিরাট ইংরাজী সাহিত্য গড়ে উঠেছে তার প্রতি সেকালের ইংরাজ যে অপরিসীম শ্রদ্ধা দেখিয়েছে এমন প্রমাণ নেই। একথা কিছুটা সত্য। এমন কি গত শতাব্দীতে লং ফেলো, এমারসন্, পো, প্রভৃতি মুষ্টিমেয় সাহিত্যিক ছাড়া, ইংরাজী সাহিত্যে ইংরাজ কবির সঙ্গে সমান আদর বা বিচার অনেক আমেরিকান কবিও পাননি। ফিজ জেরাল্ডের ওমার খৈয়ামের অনুবাদ স্বতন্ত্র সৃষ্টি এবং তার সৃষ্টিকার বিদেশীয় নন্। বর্তমান কালেও ল্যাফ কাডিয়ো হিয়ার্ন বা লেগুই ও ক্যাজমিয়ার মত দু একজন বিদেশী লেখকই ইংরাজী সাহিত্যে স্থায়ী স্থান অধিকার করেছেন। অরবিন্দ-কাব্য-বিচারে এই পটভূমিকাটি মনে রাখা বিশেষ দরকার। ইন্দুপ্রকাশে "বঙ্কিমমানস" সম্বন্ধে যখন তিনি প্রবন্ধ লিখছেন তখন তিনি নিজেই বলছেন—

"The language which a man speaks and which he has never learned, is the language of which he has the nearest sense and in which he exposses himself with the greatest fulness, subtlety and power. He may neglect, he may forget it, but he will always retain for it a hereditary aptitude and it will always continue for him the language in which he had the safest chance of writing with originality and ease. To be original in an acquired tongue is hardly feasible."

'মানুষের মাতৃভাষার মধ্য দিয়েই প্রতিভাকে বিকশিত করার সুযোগ বেশী···তাকে সে অবহেলা করতে পারে, ভুলতে পারে, কিন্তু ঐ ভাষায় তার রক্তগত অধিকার, ঐ ভাষাতেই সহজ প্রকাশ ও মৌলিকতা সম্ভব ···অন্য ভাষায় এ অসাধ্য না হলেও দুঃসাধ্য। আবার দেখি তরু দত্তের ইংরাজী ও ফরাসী কবিতা সম্বন্ধে গভীর প্রশংসা করেও শ্রীঅরবিন্দ বলছেন—"Toru Dutt, that unhappy and immature

genius who unfortunately wasted herself on a foreign language" অথচ তিনি নিজে সারা জীবন ধরে ইংরাজীতেই দর্শন কাব্য প্রবন্ধ লিখে গেলেন। হয়তো তার অন্য কারণ আছে, বৃহত্তর audienceকে তিনি জানতে ও জানাতে চেয়েছিলেন যার জন্য ইংরাজী ভাষা তার সহজসাধ্য বাহন ছিল। বাংলায় তাঁর লেখা নেই যে তা নয় কিন্তু তুলনায় ও পরিমাণে খুবই কম। প্রায় এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে যে দুয়োরাণীর কথা বলেছিলেন সে কথার উল্লেখ করলে বোধ হয় খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

"এই দুয়োরাণীর ঘরেই আমাদের একমাত্র স্থায়ী গৌরব দেশের সাহিত্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই শিশুটিকে আমরা বড় একটা আদর করি না, ইহাকে প্রাঙ্গণের প্রান্তে উলঙ্গ ফেলিয়া রাখি···বলি, ছেলেটার শ্রী দেখো। ইহার না আছে বসন, না আছে ভূষণ··· ভালো, তা মানিলাম, ইহার জীবন আছে।" সেদিন তিনি আরো বলেছিলেন—"একটুখানি অহংকার করতে দেবেন—বর্তমানের অহংকার নহে, সম্ভবতঃ ভাবী ভারতবর্ষের অহংকার···আমার নিজের অহংকার নহে···তখন আমরাই বা কোথায় থাকিব, আর এখানকার দিনের উড্ডীয়মান বড়ো বড়ো জয়-পতাকাগুলিই বা কোথায় থাকিবে। কিন্তু এই সাহিত্য তখন অঙ্গদকুণ্ডলউষ্ণীষে ভূষিত হয়ে সমস্ত জাতির হৃদয়সিংহাসনে রাজমহিমায় বিরাজ করিবে এবং সেই ঐশ্বর্যের দিনের মাঝে মাঝে এই বাল্যসুহৃদদের নাম তাহাদের মনে পড়িবে এই স্নেহের অহংকার আমাদের আছে"।

দ্বিতীয়তঃ অরবিন্দ-কাব্যের বেশ কিছু ভাগ গীতি-কবিতা ও খণ্ড-কবিতা হলেও তারা মহাকাব্যের ঘনীভূত রূপের আভাস দেয়। ঠিক 'লিরিক' নয়। তার ভাবে ভাষায় ঝংকারে বর্ণবৈচিত্র্যে, উপমায়, গভীরতম রহস্য, তত্ত্ব ও তথ্য একটা আন্তর অনুভূতির (Grand Passion) এর রূপ আনে।

তৃতীয়তঃ তাঁর কাব্যের যতটুকু প্রকাশ বাইরে তার চেয়েও গভীরতা ভিতরে— তাঁর জীবনের সম্বন্ধেও যে কথা বলা যায় তাঁর কাব্য সম্বন্ধেও সে কথা প্রযোজ্য—It has not been on the surface for men to see.

চতুর্থতঃ অরবিন্দকাব্য জুড়ে বসে আছে তার প্রচ্ছন্ন যোগিরূপ, তাই তাঁর কবি-জীবনের আবির্ভাব মধ্যাহ্ন গগনের সূর্যের মতো—(Like Minerva born in a panoply)—তাঁর পনের বৎসর বয়সে ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে St Paul's School-এর পারিতোষিক বিতরণী সভায় Wordsworth এর To the Cuckoo আবৃত্তি করে এসে তিনি সেই রাত্রে নিজেই এক কবিতা লিখলেন যার প্রথম চরণই হোল—Sounds of the awakening world পৃথিবী জাগছে, ঘুম ভাঙছে, তারই পদধ্বনি তিনি শুনছেন কোকিলের ডাকে, একথা পূর্বেই বলেছি। আর সারা জীবনের সাধনার পর সেই অমেয় আশাই সাধকের অসংশয়িতকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করে গেলেন। আলো, শুধু আলো নয়, বৃহত্তর জীবন—বৃহত্তর ঊষা, বৃহত্তম পরিণতি এই শুধু লক্ষ্য। কবি হচ্ছেন তিনি, যিনি দেখেন, অর্থাৎ Seer, তাঁর কাব্যে ছায়া পড়ে এই বাইরের আর ভিতরের জগতের। সাধারণতঃ কবির দৃষ্টি জৈবস্তরেই (Vital plane) আবদ্ধ থাকে যা তিনি পেয়েছেন অবচেতনায়, উত্তরাধিকার সূত্রে, রক্তের কৌলীন্যে, সংস্কারের বীজে, সুপ্ত কামনার এষণায়, তারই সঙ্গে আছে বাহ্য চেতনা যা আমরা দেখছি, শুনছি, স্পর্শ করছি, তার পরেও আছে বুদ্ধি চেতনা যা আমরা আমাদের বুদ্ধিবিদ্যার বিচার-বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করছি। এইখানেই সাধারণতঃ প্রকাশের সীমা শেষ। তার পরের চেতনা তা যে নামই দিই না কেন, তারই উপলব্ধি হোল বিশ্বচেতনার সঙ্গে যুক্ত, বোধি চেতনায়, তাকেই বলা যেতে পারে ঊর্ধ্বতর মানস, ভাস্বর মানস, অধিমানস, অতিমানস (Higher Mind, Illumined Mind,

Overmind, Supermind) ; সেই বিভিন্ন মানসতরঙ্গ-তলেই বাণীর সংগীতশতদল নেচে ওঠে, জেগে ওঠে। সেই সর্বভূতান্তরাত্মা অভিরূপ ভূয়িষ্ঠ সার্বভৌমিক চেতনাই অধিকারী-ভেদে বিভিন্নস্তর থেকে কবি মনে কাজ করে চলেছে। মূলে সুর ও বীজ এক, প্রভেদ শুধু বিস্তারে, পারম্পর্যে, মূল্যবোধে, সূক্ষ্ম ও গভীরতর প্রকাশে, নব নব ব্যঞ্জনার রূপায়ণে ; যা ছিল আত্মকেন্দ্রিক (ego centric) তাই বিচারবোধের রূপায়ণে হয় মূল্যকেন্দ্রিক (value centric). সেইজন্য বিভিন্ন মানসিক স্তর থেকে লেখা কাব্যেরও প্রকাশ বিভিন্ন, তার রূপ, তার ব্যাপ্তি, তার বিস্তার, তার ঐশ্বর্য, তার বর্ণসম্ভার বিভিন্ন। তাই কাব্য শুধু ছবি নয়, প্রকাশ নয়, মনোবিকলন নয়, পরিচিতি পত্র নয়, অসমাপ্ত মন্ত্র, ঋতের ছন্দ, "Legend, symbol"। শ্রীঅরবিন্দকাব্য-বিচারে এই কথাটা বিশেষ করে মনে রাখা উচিত এবং সাবিত্রী পড়লে এই সত্যটি আপনি হৃদয়ঙ্গম হয়। ধরুন, পাঁচজন কবি একটি ফুলকে দেখলেন, যিনি physical plane-এর স্তর থেকে দেখলেন তিনি দেখলেন হয়ত তার utilitarian রূপ, যিনি ভাস্বর মানসের স্তর থেকে দেখলেন তিনি হয়তো দেখলেন তরঙ্গায়িত বর্ণসুষমার মধ্যে এক বিশ্বাতীত ছন্দকে, কেউ তার মধ্যে দেখলেন "thoughts that do often lie too deep for tears," কেউ দেখলেন অসীমের ভাবব্যঞ্জনা। শ্রীঅরবিন্দ নিজেই বলেছেন, "If I had to write for the general reader, I could not have written Sabitri at all. It is in fact for myself that I have written it and for those who can lend themselves to subject matter images and technique of mystic poetry."

পঞ্চমতঃ এই প্রসঙ্গেই প্রশ্ন আসে—কাব্যের সংজ্ঞা কী, তার বিচারবস্তু কী, তার উপজীব্য বিষয় কী, তার অলংকার, তার বিভূষণ, তার আলম্বন কি রকম হবে, ভাব ও ভাষার কতটা রসায়ন হলে তাকে

সার্থক কাব্য বলবো। কাব্য কি শুধু ধ্বনির আলোক, শুধু রসাত্মক বাক্যের সমষ্টি, না মিল্টন যা বলেন তার simple, sensuous passionate হওয়া চাই। প্রাচীন কালের কবি-দার্শনিক আনন্দ-বর্দ্ধনাচার্য বললেন যে, রসাস্বাদন করিবার ও করাইবার ও পরমার্থ বস্তু প্রকাশন সমর্থ যে রীতি এই দুই মিললেই হয় কবিদের নব দৃষ্টি। এ সংজ্ঞা আজকের সমালোচক ও রসজ্ঞরা মানবেন কি না জানি না। কিন্তু কাব্যের রূপ নির্দেশ করতে গিয়ে Edwin Markham নামে American কবি যা বলেছেন সে কথা প্রণিধানযোগ্য : 'Something more than vital is released, something organically rhythmical that has no need of embellishment or conventional device to make its poetic nature explicit.'

জল পড়লো, পাতা নড়লো, শিশু চোখ মেললো মায়ের কোলে, আলোর রাজ্যে, সে বড় হ'ল, অন্নের জন্য তার বুভুক্ষা এলো, জীবিকার জন্য তাগিদ, দ্বন্দ্বময় জগতে তাকে প্রতিমুহূর্তে সংগ্রাম করতে হলো, তার রক্তে এলো জোয়ার, সে চাইলে ভোগ করতে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে, প্রতিটি অণুতে অণুতে স্পর্শে স্পর্শে সে পরিমূঢ়েন্দ্রিয় হবে, প্রিয় চাইবে প্রিয়াকে, প্রিয়া চাইবে প্রিয়কে, বীরভোগ্যা হবে বসুন্ধরা—এ সব ত প্রতিদিনই ঘটছে এই পৃথিবীতে—physical vital planeএ, রূপ রেখা সীমার জগতে এ ঘটনাপঞ্জী নিত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিধ্বনি উঠছে শুধু সংখ্যাগণনার জীবনে নয় (Quantitavely), মানসলোকের অন্তরঙ্গরূপেও (Qualilatively), এর প্রতিরূপ পাচ্ছি মনের জগতে psychological plane-এ, এমন কি psychic এ বা মনের উর্ধ্ব লোকে। কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে যে কোন সৃষ্টির কাজে এর ছায়া পড়ছে; আমরা পাচ্ছি তার রূপ, বর্ণনা, দ্বন্দ্ব, বিচার রসোদ্বেলতা। আধুনিক সমালোচক বলবেন—এরপর আর এগিয়ো না—জীবন দর্শন করো ক্ষতি নেই কিন্তু জীবনের সঙ্গে দর্শনকে জড়িয়ে

তাকে দুর্বোধ্য করো না—এর মধ্যে অতীন্দ্রিয় আরোপ, বিশ্ববাসনার কল্পনা, বা বিশ্বনীতির ছন্দের সংযোগ, হার্মনি বা সৌষম্য এসব এনো না—তাই অনেকের কাছে অতীন্দ্রিয় বা আধ্যাত্মিক আবেদনের স্বীকার ত নেইই, মূল্যও তারা দেননা, কারণ রক্তমাংস কামকামনার বাইরে শ্যামকান্তিময়ী স্বপন মায়ার অথচ সত্যের, ঋতের যে জগত আছে, তা তাঁরা মানেনই না। অজানাকে জানার যে বুভুক্ষা তার অস্তিত্ব আছে কি, এইটেই তাঁদের কাছে মহতী বিনষ্টির প্রশ্ন। মানুষ যে দ্বৈতের দোলায় দুলচে, তার এক কোটীতে সীমা, আর-এক কোটীতে অসীম—এই দুই নিয়েই তার দ্বন্দ্ব, তার ভাবভাবনা, একথা যাঁরা স্বীকার করে নেন তাঁরাই বলেন কবি তিনি যিনি এই মৃন্ময় মনের বিস্ময় অভিসারকে ছন্দে-কাব্যে, রূপে-রসে, ভাবে-ভাষায় ফুটিয়ে তোলেন। সম্মুখে প্রাণের নদী জোয়ারভাটায় ছায়া আর আলো, মন্দ আর ভালো নিয়ে নৃত্যছন্দে বিচিত্র ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে, সেই বিশ্বপ্রবাহে ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চলা নদীর আবর্তনে যে ছবি ফুটছে, যে ছন্দ উঠছে কবি তাকেই বাঁশীতে ধরছেন, তুলিতে আঁকছেন, ভাষায় রূপান্তরিত করছেন,। রবীন্দ্রকাব্যে বারে বারে এই সার্থক ছবি পেয়েছি, ভূমার মধ্যে যে সীমা আছে, মাটির মধ্যে যে মা আছেন, যে অপরূপ প্রাণ-বীজের ক্রিয়া হচ্ছে তারই বিচিত্র গীতি, গাথা ও গান। তাই কবির ভাষায় তাঁর হৃদয়মনের বীণাযন্ত্রটি জড়যন্ত্র নয়—এ হচ্ছে প্রাণবান—এর সুর এগিয়ে চলেছে, এর সপ্তক বদল হচ্চে, এর তার বেড়ে যাচ্চে—একে নিয়ে যে জগৎ সৃষ্টি হচ্চে, সে কোথাও স্থির হয়ে নেই, কোথাও গিয়ে সে থামবে না, সে এগিয়ে যাবে। কবি সেই বিচিত্ররূপিণীর প্রেরণায় অনুপম উপমা ও কল্পনার সাহায্যে বুদ্ধিকে উন্নীত মার্জিত ও শাণিত করেছেন, অন্তরকে রসায়িত ও রূপায়িত করেছেন, ঐশ্বর্যময় ভাবময় কল্পলোকের সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রকাব্য এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর কাব্য অবচেতনা ও বাহ্যচেতনা পেরিয়ে বুদ্ধি ও বোধি চেতনার

সঙ্গমতীর্থে পৌঁছেচে। রবীন্দ্রনাথের বাণী শুধু শ্রীময়ী নয়, হ্রীময়ীও। যদিও তিনি বললেন, আমি মাটির কবি, ধরণীর কাছাকাছি থাকি এবং সেই শুভে-অশুভে স্থাপিত পাদপীঠে তাঁর ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত জীবনের প্রণতি রেখে গেলেন, তবু সেই নামগ্রাসী আকাশগ্রাসী সব পরিচয়-গ্রাসী নিঃশব্দ ধূলিরাশির মধ্যেই তিনি বৃহতের, মহতের, ভূমার গান গাইলেন। মহৎ মৌনের গিরিশৃঙ্গমালায় বসে শ্রীঅরবিন্দ আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন, তিনি বললেন—Poetry is a rhythmic speech which rises atonce from the heart of the seer and the distant house of truth…The greatest poets are those who had a large and powerful interpretative and intuitive vision and whose poetry arises out of the revealatory utterance of it. কাব্য ধ্বান্যত্মক ও রসাত্মক বাক্য বটে—কিন্তু সে ঋতম্ভরা বাক্ বসে আছেন দ্রষ্টার বুকে যিনি দেখছেন সত্যকে—দূর থেকে—এই সত্যদৃষ্টিই হচ্ছে আসল—একেই রূপ দিচ্ছেন, ছন্দায়িত করছেন কবি—দ্রষ্টাই হচ্ছেন স্রষ্টা।

শ্রীঅরবিন্দও মাটির কবি, কিন্তু সে মাটি তপস্যার স্বর্ণায়নের alchemyতে সোনা হয়ে গেছে—মধুরজঃ মিশেছে মধুদ্যৌঃ এর সঙ্গে—আস্পৃহার আগুনে সে পুড়েছে—যে অগ্নি আমার পুরোহিত যে অগ্নি কবিক্রতু, ক্রান্তপ্রাজ্ঞ, যে অগ্নি বর্ধমান, যে অগ্নিকে বৈদিক কবি 'ইলে' 'ঈড়স্তবৌ'—পূজা করেছেন, স্তব করেছেন—যে অগ্নি রমণীয়—রমণীয়ত্বাৎত্রত্নং—দধাতি ধাতুরত্রদানার্থ বাচীতি তদিদং নিরুক্তকাব্যস্য যাস্কস্য মন্ত্র ব্যাখ্যানম্।

বলা যেতে পারে শ্রীঅরবিন্দের কাছে কাব্যলক্ষ্মী ধরা দিলেন আস্পৃহা রূপে, অগ্নিরূপিণী হয়ে, উত্তরসাধিকারূপে, প্রজ্ঞা ও পারমিতা রূপে, সম্বোধি রূপে। কস্মৈ দেবায়—এ প্রশ্ন চিরন্তন। উপনিষদের ঋষি থেকে আজকের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই প্রশ্নই করেছেন পশ্চিম

সাগরতীরে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়, কে তুমি—মেলেনি উত্তর। আজকের সাগর থেকে ফেরা কবিও বলছেন—

এ জোনাকি মন জানি
কোনদিন পাবে না উত্তর,
চারি দিকে অন্ধ রাত্রি
তামসী দুস্তর
মৌন নিরন্তর।

তবু কবি আঁধারের গূঢ় ধ্বনি শোনেন, সৃষ্টির ছপ্ ছপ্ বেয়ে চলার মধ্যে জোনাকির মত জিজ্ঞাসার স্ফুলিঙ্গকে দেখেন এবং জানা না-জানার বাইরে অন্য উত্তরণের জন্য তিনি প্রয়াসী। কবি অরবিন্দের কাছেও প্রশ্ন আসে কে তুমি, কি তুমি—Who…

We have seen Him a muse on the snow of
the mountains
We have watched him at work in the heart
of the sphere
He is lost in the heart, in the Cavern of Nature
He is found in the brain where he builds
up the thought
In the pattern and bloom of the flowers he
is woven
In the luminous net of the stars he is caught

তাঁকে আমরা দেখেছি
ঐ স্তব্ধ তুষার শৃঙ্গের নীরব মহিমায়
সুগভীর গরিমায়
মহাশূন্যে আকাশের নীলিমায়
যেখানে তিনি কর্ম্মব্যস্ত

তিনি হারিয়ে গেছেন আমার মনে
মহাতামসীর গহ্বরে
তাঁকে পেয়েছি আমার চিন্তায়
ফুলের স্তবকে স্তবকে
নিশীথিনী তারার ভাস্বর জালে,

তাইতো উপনিষদ বলেছেন, তিনি জেগে আছেন ঘুমন্তদের মাঝে, তিনি বসে আছেন অন্ধকারের অন্তরে। কে তিনি—

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে
প্রশিষং যস্য দেবা
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম

আপনারে দেন যিনি সদা যিনি দিতেছেন বল
বিশ্ব যাঁরে পূজা করে পূজে যাঁরে দেবতা সকল
অমৃত যাঁহার ছায়া, যাঁর ছায়া মহান মরণ
সেই কোন দেবতারে হবি মোরা করি সমর্পণ

He is close to our hearts had we vision to see.
আমরা দেখতে পাই না, কারণ আমরা দৃষ্টিহীন

In some faint dawn
In some dim eve
Like a gesture of light
Like a dream of delight
Thou comest, nearer, nearer to me.

যেন কোন ছায়াঘন প্রত্যূষের আলোতে, কোন বিস্মৃত সায়াহ্নের প্রতীক্ষায়, নির্জন প্রাঙ্গণে কবি তাঁর পদধ্বনি শুনছেন, দয়িততম আসছেন 'দীপশিখা সম, আনন্দ স্বপন মম'—'তুমি আসো' আরো আরো নিকটে আরো।'

তাইতো বৈদান্তিকের প্রার্থনা ওঠে সেই বিরাট্ মহীয়ানের কাছে, যাঁর স্বরাট্ ছন্দের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আত্মার জয়গান বাজচে—কবি বলছেন

Remove my sullied centuries
Restore my purity
Hidden door of knowledge, open
Strength fulfil thyself
Love outpour.

শতশতাব্দীর পুঞ্জিত কালো, তোমার আলোয় দূর হয়ে যাক্ অগ্নিপ্লাবনে শুদ্ধ করো, দাও গো ফিরায়ে পবিত্রতারি, জ্ঞানের গোপন দুয়ার খুলিয়ো, ধ্যানের শুচিতায় ভরিয়া তুলিয়ো—শকতি দাও শকতি দাও, এই প্রার্থনাই শুধু নয়—শকতি অর্জন করে অনেকেই, কিন্তু শকতিকে সংযত, সংহত করে সম্যকের কাজে লাগাতে হয় তবেই সার্থকতা। কবির শেষ কথা Love outpour—প্রেমের প্লাবন যেন ঝরঝর ঝরে বারিধারার মত, যেন সেখানে কোন কার্পণ্য না থাকে, না থাকে কোনো দৈন্য।

॥ দশ ॥

প্রাচীনকালে ঋষিকবির অনুভূতিতে জেগেছিল

অসুনীতে পুনরস্মাসু চক্ষু
পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম
জ্যোক পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তম
অনুমতে মৃড়য়ঃ ন স্বস্তি

প্রাণের নেতা আমাকে চোখ দিয়ো, আবার দিয়ো প্রাণ, দিয়ো ভোগ, উচ্চরন্ত সূর্যকে আমি দেখবো, আমাকে স্বস্তি দিয়ো। মায়ের কোলে জন্মগ্রহণ করেই আমরা চোখ মেলি আলোর রাজ্যে, ধ্বনির

গুঞ্জন শুনি। আমরা শুধু বাঁচতেই চাইনা, জানতেও চাই, প্রকাশ করতেও চাই—I exist, I know, I express—যা আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বোধের সীমার মধ্যে তা নয়—যা আমার কাছে অস্পষ্ট, যা আমার শুধু অবচেতনে নেই, অধিচেতনেও আছে। এই সংজ্ঞা অনুসারে প্রত্যেক মানুষই, শুধু মানুষ কেন, প্রতিটি সৃষ্ট জীবই প্রকাশের দ্বন্দ্বে ব্যাকুল এবং সকলেই সেই হিসাবে কবি বা শিল্পী। প্রাচীন গুহামানব যখন একটা অতিকায় জন্তুর আভাস দিয়ে রেখার আঁচড়ে বা Hieroglyphics এঁকে নিজেকে প্রকাশ করতে চায় তখন সে স্রষ্টা, শিল্পী, কবি, দার্শনিক। যখন এই প্রকাশ হয় ভাষার মাধ্যমে তখনই তাকে বলি কবি।

আমি কবি, আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি

এ কথা অতিমাত্রায় সত্য কিন্তু বাস্তবধর্মী কাব্যেও কবির মানসিক অধিকারভেদে শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় interpretative, intuitive বা revealatory—অর্থাৎ তার রূপকে দ্যোতনায় ব্যাঞ্জনায় অন্য অর্থের সন্ধান দেবে না তাও নয়। তাই প্রশ্ন ওঠে রসোত্তীর্ণতা বলতে আমরা কি বুঝি। ভাষা ও ভাবের রসায়নে, তার সম্যক্ ছন্দোবদ্ধতায়, তার সরসতায় যদি কোন কবিতা পাঠকের মনকে আপ্লুত করে তোলে, তাকে ভাবিয়ে তোলে, চিন্তার খোরাক্ জোগায় তখনই আমরা বলি সে কাব্য সে সাহিত্য রসোত্তীর্ণ। তাই রসোত্তীর্ণতার মাপকাঠি যুগে যুগে মানুষে মানুষে বদলাতে বাধ্য। জনগণের মনবিনোদনই যদি কাব্যের কাম্য হয়, সে জনগণ কোন জন। যে যে স্তরের লোক সে সেই স্তরের দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষাদীক্ষা, আচারবিচার, পারিপার্শ্বিক মানসিক সৌকর্য দিয়ে কাব্য-বিচারে আসন লবে। শরৎচন্দ্র বলতেন দাশুরায়ের পাঁচালী আমার পিতামহের কণ্ঠহার ছিল, কিন্তু তাই বলে কাব্যের মূল্যনিরূপণে আজকের নিরীখে তার দাম কতটুকু সে-কথা উঠলেই প্রশ্ন

উঠবে সাহিত্য কি শাশ্বত।—সেক্সপিয়রে ম্যাকবেথের আখ্যানভাগ পুলিশকোর্টের কাহিনী হতে পারতো কিন্তু রসিক কবির হাতে পড়ে হয়েছে রসোত্তীর্ণ নাটক। কিন্তু তাতেই যে সব কবির মন পরিতৃপ্ত হয় তা নয়। ভবভূতি নিজের কালের সীমা ছাড়িয়ে নিরবধিকাল ও নিজের দেশের শাসন ছাড়িয়ে বিপুলা পৃথ্বীতেই সহৃদয় পাঠককে খুঁজলেন। যুগেযুগে কাব্যের প্রকাশবৈচিত্র্য অলংকরণের রীতি রূপ-সজ্জা বাচনভঙ্গি বদলাতে বাধ্য কিন্তু সব মিলিয়ে, শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র যা বলেছেন, শব্দনির্ভর একটি গভীর সুষমাবোধ যদি না থাকে, তার অন্তর্নিহিত বক্তব্যকে যদি সুঠাম ভঙ্গিতে রসস্নিগ্ধ করে ব্যক্ত করতে না পারে, তাহলে কাব্য হিসাবে তার দাম কমতে বাধ্য।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একালের একজন কবি বললেন—

গুরুদেব জানতেন কবি অমৃতের দূত
তাই তার নাট্যে সঙ্কট সময়ে হঠাৎ অদ্ভুত
বহুরূপী ঠাকুর্দাকে দেখি কিম্বা কবিকে
আধ্যাত্মিক মুস্কিল আসান তারা করে
তারপর জল পড়ে, পাতা নড়ে। তারপর
সত্য শিব সুন্দর
আমি রোমান্টিক কবি নই, মার্কসিষ্ট
অনেকে জিজ্ঞাসা করে—গুরুদেবের দৃষ্টির সঙ্গে
তোমার তফাৎ কি...
তিনি একঘেয়ে খেয়া পারাপার করছেন
আর আমি ডুনৌকোয় পা দিয়ে বুর্জোয়া
মাখন আর মজুরের ক্ষীর খাচ্ছি। (সমর সেন)

কিন্তু চিরকালের কাব্যলক্ষ্মী ঠিক বণিতা নন যে 'পদবিন্যাসমাত্রেন যয়ানাপহৃতং মনঃ'।

যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে, রূপ হতে রূপে

ক্রমশঃ এই সৃষ্টিই রূপলোকের সীমা ছাড়িয়ে অপরূপ রসলোকে পৌঁছয় এবং শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় "সেই প্রত্যন্ত দেশ অতিক্রমণেরই অফুরন্ত সংগীত মন্ত্রমুগ্ধ স্তরে অন্তরাত্মার সত্যরূপের জ্যোতি ও ধ্বনি মানবজীবনের সূক্ষ্মতর প্রকাশের মধ্যে নবনব নিগূঢ় অর্থ আনিয়া পৌঁছাইয়া দেয়।"

এই কথাগুলির অবতারণার উদ্দেশ্য এই যে, কবি শ্রীঅরবিন্দের বা রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্যক্ বিচার করবার আগ্রহ যাঁদের হবে তাঁদের এই মুল সূত্রটি পুর্বেই হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। তাঁদের জীবনের, তাঁদের সাধনার, তাঁদের কাব্যের ভিত্তি এই পার্থিব রজে এই মাটির পৃথিবীতে—ইহৈব—এইখানে এই কাম-কামনা-ক্লেদের মধ্যেই লুকিয়ে আছেন যিনি বীজে, প্রকাশে, সীমায়, রূপে, কারণ

God lives hidden in the clay

কিন্তু মাটিতে যে জীবনের আরম্ভ, আকাশে তার সমাপ্তি। বৈরাগ্য-সাধনেই মুক্তি এই শেষ কথা নয়। তাঁদের কবি-জীবনের প্রথমে তাই এই মাটি, আলো, বাতাস, মানুষের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় পাই এবং পরের জীবনের সাধনাতেও এই মুক্ত রূপটিও দেখি। তাই সম্পূর্ণ বিচারে কবি শ্রীঅরবিন্দকে যোগী শ্রীঅরবিন্দ থেকে পৃথক করে দেখা সুষ্ঠু ও সঙ্গত নয়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও সেই কথা, তাঁর কবিকে মানস সুন্দরী বা জীবনদেবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায়না। এই অদৃশ্য সাধনার আরম্ভ কৈশোর থেকেই। অল্প বয়সেই তাঁদের জীবনে এসেছিল এক গভীর পরিবর্তন। তাছাড়া সাধারণ ভাবেও আমরা সাহিত্যসৃষ্টিকে সাধনা বলতে পারি। সাহিত্যিক যখন ভিতরের তাগিদে বাক্যের মাধ্যমে রসসৃষ্টি করেন তখন তিনি "Craftsman" বা কারু-

শিল্পী নন্—তখন তাঁর আঙ্গিক রচনাশৈলী এ সব গৌণ, তখন তিনি মানস স্রষ্টা, শুধু রূপকার নন। সাধনা বলি কাকে, না, যা মানুষকে নবনব সৃষ্টির প্রেরণা দেয়—সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যসাধক নিজেকে আবিষ্কার করেন—খণ্ড জীবনের মধ্যে তিনি অখণ্ডের পরিচয় দিতে চেষ্টিত হন—আসল কবির কাছে তার কাব্য শুধু নিজেকে, সমাজকে, জীবনধারাকে, চিন্তার বিশিষ্ট ভঙ্গিতে প্রকাশ করাই সব নয়—সবচেয়ে বড় কথা হচ্চে আত্মআবিষ্কার এবং সেই আনন্দ উপভোগ অখণ্ড আস্বাদেরই সহোদর হতে বাধ্য, কারণ সেখানে বুর্জোয়া কবিই হোন্, আর অতীন্দ্রিয়-বাদী মরমী কবিই হোন, সবাই নিজের নিজের স্তর থেকে যে সৃষ্টি করলেন তারই লীলারস আস্বাদনে একান্তভাবে মগ্ন। জীবন মানেই সৃষ্টি, সৃষ্টি মানেই নিজেকে ফিরে পাওয়া। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে কাব্য হোল 'Expression of thought' শুধু নয়, 'expression of the personality of the poet'-ও বটে। আবার ঠিক উল্টো কথাও শোনা যায় যে কাব্য হচ্চে—escape from personality. তাইশ্রীঅরবিন্দ তাঁর "The Future Poetry"তে বললেন, Everywhere there is a seeking after some new thing, a discontent with the moulds, ideas and powers of the past, a spirit of innovation, a desire to get at deeper powers of language, rhythm, form, because a subtler and vaster life is in birth. There are deeper and more significant things to be said than have yet been spoken and poetry, the highest essence of speech, must find a fitting voice for them.

কাব্য শুধু জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস বা জীবনস্রোতের flux of life) এর প্রকাশই নয়। কবিতার মাধ্যমে কল্পনাশ্রয়ী মানব মন শুধু বাইরের জগতকে মনের লীলার সঙ্গে গ্রথিতই করছে না, তাকে

পদে পদে রূপায়িত করে, বৈচিত্র্যময় করে তাকে সঞ্জীবিত, উদ্দীপিত করে অর্থ বুঝিয়ে দিচ্চে না—সে এক অসন্তুষ্টির সুরও বহন করে নিয়ে চলেছে—সে বহন করে নিয়ে চলেছে একটি অতৃপ্তির ধারা—এ অতৃপ্তি শুধু ভোগের উপাদানের অভাবে নয়, অনেকের মধ্যেই উন্নততর বৃহত্তর জীবনের জন্য কান্না—যে জীবন জন্ম নিচ্চে ক্ষণে ক্ষণে আমাদের মনে তারই প্রসববেদনা। যে জীবনের রূপ কী হবে, সেটা এহ বাহ্য —আমার মনের আস্পৃহাই আমাকে ছটফটিয়ে তোলে, কাতর করে, ব্যাকুল করে—তারই প্রকাশ আমার কাব্যে, আমার চিন্তার ধারায়, আমার সমাজগত সাধনায়। কিন্তু সমালোচক তার সঙ্গে জুড়ে দিবেন স্টাইলের চমৎকারিত্ব, রচনার শৈলী, ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগ, ছন্দের বন্ধন।

রীতিষু, রেখাস্বিব চিত্রং কাব্যং প্রতিষ্ঠিতম্। ভামহ, দণ্ডী, আলংকারি করা বলবেন শ্লেষ, ওজঃ প্রভৃতি গুণের কথা। এক কথায় কাব্যের প্রধান গুণ হবে ধ্বনি। আজকালকার ইংরাজ কবি C. Day Lewisর কথা ধরা যাক্। যখন তিনি বললেন

Somewhere beyond the rail-road
of reason, South or north,
Lies a magnetic mountain
Riveting sky to earth.

... ...

Iron in the soul
Spirit steeled in fire,
Needle trembling on truth
These shall draw me there.

তখন একে কাব্যের রাজ্যে সাদরে অভ্যর্থনা করতেই হয় কিন্তু আজকের কবি যখন লিখবেন—

'হাজরা পার্কে সভা কাল, নিরপেক্ষ থেকে আর চিত্তে নাহি সুখ' বা
'মাংসের ছুর্ভিক্ষ নইলে ঋষি মনে হতো হাবে ভাবে' কিম্বা

'গলিত নখ পৃথিবীতে আমরা রেখে যাবো সংক্রামক স্বাস্থ্যের উল্লাস
'আমাদের ম্লান জীবনে তুমি কি আসবে, হে ক্লান্ত উর্বশী,
'অগ্নি বর্ণ সংগ্রামের পথে প্রতীক্ষায় এক দ্বিতীয় বসন্ত
'উজ্জ্বল রৌদ্রের দিন কাটুক যৌথ কর্ষণায়
আর ক্ষুর প্রত্যঙ্গ তরঙ্গ তুলুক কারখানায়

বা 'নগ্ন নির্জন হাত' যখন বনলতা সেনকে ডাকে বা আকাশলীনা সুরাঞ্জনাকে বা মিশরের মমী মৈনাক সৈনিককে তখন আমাদের কোথাও হারিয়ে যাবার নেই মানা, একথা ঠিক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে কাব্য শুধু কথার আঙ্গিকেই পর্য্যবসিত নয়, তার রচনাভঙ্গি, তার বাচনসর্বস্বতাই সব নয়, কারণ তাহলেই প্রশ্ন উঠবে—

কথাগুলি যদি ভুলে যাই, তবে কী হবে, তবে কী হবে'—

জীবন যদি শুধু কথাই হয় তাহলে এ সমস্যা সত্যই গভীর—সত্যই ততঃ কিম্—কী হবে—

রাত্রির দূষিত রক্তে বিকলাঙ্গ দিনের প্রসবেই কি আমাদের তন্দ্রা ভাঙবে।

তবু একথা স্পষ্টভাবেই স্বীকার করবো যে আজকের যুগের কবিতাকে দেখে মুখ ফেরাবার দিন ত নেইই, বরং তার মধ্যে আমরা যে নতুন স্বীকৃতির ঘন পরিচয় পেয়েছি সেইটেই আশার কথা—এগিয়ে চলাই যদি জীবন হয় তবে সমাজ প্রাণের কাছে এই বিভিন্নমুখী প্রণামকেও অস্বীকার করবো কোন সাহসে—এও রূপের কাছে, রসের কাছে, প্রণাম, তার হিল্লোলকে, কলকল্লোলকে স্বীকার করা, কিন্তু মানুষের অভীপ্সা শুধু এটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকবে কেন ?

আমার ঠিকানা খোঁজ করো শুধু সূর্যোদয়ের পথে।

এ শুধু জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত ভাসাভাসা সত্য নয়, তরুণ কবির মানসে উদিত সূর্য্যেরও জয়গান—কিন্তু সূর্যোত্তর পথও কি কিছু নেই ?

যিনি এই পথের সন্ধান পেয়েছেন তাঁর কাব্যসেই দিকে বাস্তব এবং সত্য—তিনি যে দেখেছেন শতসহস্র সূর্যের পথ—পরম বিবস্বানের পথ। যখন কিছুদিন আগের আধুনিক কবি গাইলেন 'আমি কবি কামারের ছুতোরের মুটে মজুরের' তখন একে শুধু প্রলেটেরিয়াট্‌ বিশেষণে বিভূষিত করলেই কাব্যের অর্থ সরল হোল না। এখানে কবিমানস জানতে চাইছে 'মানুষের মানে চাই গোটা মানুষের মানে'। এও আত্মার কান্না—এও ভূমার জন্য অভীপ্সা—আমি অতৃপ্ত, আমি ক্ষুণ্ণ, আমি বিষণ্ণ, আমি জানতে চাই—এই মানুষের মানে—যে মানুষের অধিষ্ঠান সকলের মাঝে—সর্বং খলু ইদং—যে মানুষ শুধু রাজা মহারাজ বিদ্যা-অবিদ্যার চাপরাশধারী নয়, মুটে মজুর, কুলিকামিনও বটে, যে মানুষ সর্বক্ষণ হচ্চে—সত্য লীলাবাদীর সূত্রই ত এই।'

অগ্নি আখরে আকাশে যাহারা লিখেছে আপন নাম,
আমি যে তাঁদের চিনি।
তুই তরঙ্গ তাহাদের রথে, উদ্ধত উদ্দাম
শোনো তাঁর শিঞ্জিনী।

(প্রেমেন্দ্র মিত্র)

সাধারণ সাহিত্যে আমরা খুঁজি আমাদের পরিচিত জীবনের ছবি, তার ব্যাখ্যা, তার পল্লবিত মনস্তত্ত্ব, উদ্বেগ, উল্লাস, বেদনা—কিন্তু যাঁদের জীবনে,—হতে পারেন তাঁরা ভ্রান্ত, বা জীবন দ্বৈরথে ক্লান্ত—মহাজীবনের শরণ নেমেছে, তাঁদের realism ত শুধু সেইটুকুতেই তৃপ্ত নয়। ধরে নিলাম তাঁরা যা বলছেন সেটা তাঁদের কল্পনারই জের, ধরে নিলাম অধ্যাত্ম সাধনা বা মানস চেতনার কথা আমার কাছে হয়তো মিথ্যা কিন্তু যাঁর এ অপরা অনুভূতি হয়েছে তাঁর কাছে সেইটাই অতিমাত্রায় বাস্তব্‌। তাঁর কাব্যের ছটা যদি সাধারণ রক্তমাংসের, কামকামনার, লোভলালসার বদ্ধভূমি পার হয়ে অন্য জগতের সন্ধান দেয় তবে সেই কবির কাছে সেইটেই realism বা বাস্তবতা। সেখানে

সাধারণ কাব্যেরও একটা অসাধারণ অর্থ হয়ে ওঠে, যেমন শ্রীঅরবিন্দের নিম্নলিখিত কবিতায় ঃ

Many boons the new years make us
But the old world's gifts were three
Dove of Cypris, wine of Bacchus
Pan's sweet pipe in Sicily.
Love, wine, song, the core of living
Sweetest, oldest, musicalest
If at end of forward striving
These life's first also proved best

নূতন দিনে পেয়েছি জানি, অনেককিছু দান
জীবনে মোর জোয়ার লেগেছে, লগ্ন ভোলার তান
পুরানো পৃথিবীর তিনটি সাথী
যাদের লয়ে ছিলাম মাতি
মনের কূজনে প্রাণের গুজনে, রতিআরতিতে প্রচুর
সুন্দরী, সুরা আর সুর
প্রেম, মদিরা আর গান
দিয়েছিলো যারা জীবনেরে মোর রসোত্তম মান
ছন্দে গন্ধে মধুরতায়
সুপুষ্পিত বিহ্বলতায়
এই প্রথমেরা লভিত যদি শ্রেষ্ঠের সম্মান
ঊর্ধ্বতমের আস্পৃহাতে পূর্ণের অবদান।

॥ এগারো ॥

অনেকে বলেন, শ্রীঅরবিন্দের কাব্যবিচারে কবি শ্রীঅরবিন্দের চেয়ে যোগী শ্রীঅরবিন্দই চেপে বসেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্চে, কবিকে বাদ দিয়ে তাঁর কাব্যজিজ্ঞাসার মূল সূত্রটিকে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা—যৌবনকালে তিনি প্রেমের কবিতা লিখেছেন, কিন্তু সমস্যা উঠবে তিনি কি প্রেমের কবি—যে প্রেমের কবিতা বলতে আমরা পূর্বরাগ, অনুরাগ, মিলন, বিরহ, মান, অভিমান, খণ্ডিতা, উৎসুকা, কলহান্তরিতা, বিপ্রলব্ধা, বিচলিত মুগ্ধনাগরের কথাই বুঝি। শ্রীঅরবিন্দকাব্যে প্রেমের স্থান কোথায় সে বিষয়ে পরে আলোচনা করবো, কিন্তু যৌবনের কবি শ্রীঅরবিন্দ প্রেমের কবি নন এ কথা বলা শুধু অশোভন নয়, প্রমাণবিরুদ্ধও। তিনি তরুণী এস্তেলকে প্রেম নিবেদন করছেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে—দুজনে মুখোমুখী, গভীর দুঃখে দুঃখী, পুষ্পিত যৌবনকে ফুটন্ত করছেন কিন্তু দেহের পৃথিবীর বাইরে কল্পনাশ্রয়ী মনের উর্ধ্বলোকে যে অযুত তারার অম্বর আছে সে-কথাও বলছেন। এতো শুধু কীটসের বা অন্য কোন কবির অনুকরণ নয়। তিনি তাঁর ভ্রাতা মনোমোহনের চেয়ে নীচু দরের কবি এ প্রশ্নও অবান্তর, যেমন অবান্তর তাঁর একমাত্র কৃতিত্ব যে তিনি ইংরাজীতে 'মিষ্টিক্' কাব্যরচনায় ব্লেককেও ছাড়াইয়া গিয়েছেন, বা গ্রীক ছন্দের Quantitative metre নিয়ে পরীক্ষায় পাশ করেছেন, যে পরীক্ষায় স্পেন্সার, সিডনী, টেনিসন প্রভৃতি কবিগণ হার মেনেছিলেন।

আবার যাঁরা বলেন যে, শ্রীঅরবিন্দ শুধু যোগের বড় বড় কথাই বলেছেন, সংসারের জগতের বিরহবেদনার অংশ গ্রহণ করেননি, অভাব অনশন অতৃপ্তির কথা বলেন নি, তাঁরা জানেন না যে, মানব জাতির কত ব্যথা তিনি নিজের বুকে বহন করতেন। তাই তিনি বারীনকে লিখলেন—

What can an imperfect man going in the midst of imperfect men, achieve? তাইতো চিত্তরঞ্জনকে লিখলেন—আমূল পরিবর্তন দরকার, গড়তে হবে আরো গভীরতর ও নূতনতর ভিত্তিতে। এই সেদিনেও তাঁর অবারিত দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখলেন

I look across the world and no horizon walls my gaze
I see Paris and Tokio and Newyork
I see bombs bursting on Barcelona and Canton streets
Man's numberless misdeeds aud rare good deeds take place within my single self
I am the beast, he slays, the bird he finds and saves
The thoughts of unknown minds exalt me with their thrill
I carry the sorrow of millions in my lonely breast.

তিনি বললেন, আমার দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে গেছে এই বিশ্বে, কোথাও নেই বাধা; তাইতো তিনি দেখলেন—প্যারিস, টোকিও, নিউইয়র্ককে একই সুরে সাধা

বম্ব পড়ছে বার্সিলোনায়, ক্যাণ্টনের রাস্তায়, জনারণ্যে
সংখ্যাগণনার অতীত মানুষের যে কুকীর্তি
সবই ঘটছে আমার মাঝে, যা কিছু সামান্য সুকীর্তি তাও…

তাঁর অসংশয়িত চিত্তে প্রকাশ পেলো—

আমিই সেই পশু, যাকে সে মারে, প্রাণ নেয়
আমিই সেই পাখী যাকে সে বাঁচায়, প্রাণ দেয়

তাই

অনাদিসৃষ্টির যজ্ঞহুতাগ্নি হতে যে মানসধারা বহমান উচ্ছ্বসিত
যা এখনও অজ্ঞাত, সবই তাঁকে উদ্বেলিত করে উল্লসিত করে
আমি বহন করে চলেছি সব মানুষের দুঃখকে

—বিশ্বমানবের প্রতি এই যে দরদ, এই যে আত্মীয়তাবোধ—এইতো সমব্রহ্মের জ্ঞান—বৈষ্ণব পরিভাষায় অনন্ত মমতা থেকে সর্বত্র সমতা।

I am the the messenger of Human Race
I am the pioneer from death and night
I am the nympholet of Beauty's face
I am the hunter of the immortal light
It is the fire of an awakened soul
Aspiring from death, to reach eternity
I claim for men the peace that shall not fail
I claim for Earth the unsorrowing timeless bliss
I seek God strength for souls that suffer in hell
God Light to fill that ignorant abyss.

আমিই সমগ্র মানবজাতির দূত, যে আমি মৃত্যু ও রাত্রিকে অতিক্রম করে এসেছি—যে আমি সুন্দরের প্রতিমা—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সে আমি যে

অমরার অসীমতা মাটিতে নিয়েছে সীমা
নাম কি প্রতিমা

আবার আমিই ত অমৃত আলোকের শিকারী—উদ্দীপ্ত সত্তার অগ্নিই আমার সম্বল, সান্ত থেকে অনন্তের পথে আমি যাত্রী, আমি চাই সেই পরাশান্তি যা কখনো পরাজয় স্বীকার করে না, আমি চাই এই পৃথ্বীর জন্য দুঃখহীন কালহীন আনন্দের স্রোত—শোকে তাপে তপ্ত দুর্বলদের জন্য ভাগবতী বল, ভাগবতী আলো অন্ধ অজ্ঞান গহ্বরের মাঝে। তাই মানুষকে এই ডাক সে যদি নৈঃশব্দে (Into the silence) ঢুকতে পারে বেরিয়ে এসে (Out of the silence) সে পাবে শক্তি আলো জ্ঞান।

যদিও নিছক কাব্য হিসাবে শ্রীঅরবিন্দের কাব্যগুলি রসিকের মনে দোলা দেয়, তার উর্ধ্বতর আস্পৃহাকে ভাস্বর করে তোলে তবু

তাঁর সাধনার সঙ্গে তাঁর কাব্যের নিগূঢ় সম্বন্ধ। যদিও প্রথম যুগে তাঁর কবিতাগুলি একজন সাধারণ মরমী কবিরই পরিচয় বহন করে, এবং তাঁর ভাব ও ভাষা, তাঁর ছন্দ ও ব্যঞ্জনা যে-কোন অন্য কবির লেখার সঙ্গেই তুলনীয়, কিন্তু তাঁর মধ্যে যে একটা অন্য বীজও সুপ্ত ছিল তা তাঁর পরের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই স্পষ্ট হবে—তাছাড়া কবিকে সম্যক জানতে গেলে তাঁর কাব্যবিচারই সব নয়—তার পিছনে যে কবি সত্তা বসে আছেন তাকেও দেখতে হবে। তাই তাঁর যোগজীবনের কথা না বললে তাঁর কাব্যবিচার অসম্পূর্ণ হয়। তিনি নিজেই বলেছেন—

It would be only myself who could speak of things in my past giving them their true form and significance. নিজের অতীত জীবনে যা ঘটেছে তাকে তার প্রকৃতরূপ ও অর্থ দিতে পারেন কবি নিজে।

মানুষের আন্তর জীবনে ক্ষণে ক্ষণে যে বিপ্লব ঘটে, দিনে দিনে যে রূপান্তর হয়, মনে মনে যে নূতনের আভাস আসে তাঁর সম্পূর্ণ কথা কবি, কথাশিল্পী, চিত্রকর বক্তৃতায় বাণীতে রেখায় প্রকাশিত করতে পারেন কিনা সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। তাই শ্রীঅরবিন্দের মতে Life actual at its best is a broken rhythm. তিনি বললেন, প্রকৃত আর্টের কাজ হচ্চে জানিয়ে দেওয়া—প্রকৃতি কি, মানুষ কি, ভগবান কি ?

এই প্রসঙ্গেই একটি কথার শুধু উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হ'ব—অরবিন্দকাব্যের ছন্দ। তিনি নিজেই সাবিত্রী সংক্রান্ত চিঠিপত্রে ও তাঁর Collected Poems and Plays-এর পরিশিষ্টে ইংরাজী কাব্যে ছন্দ সম্বন্ধে চসার থেকে স্টিফেন স্পেণ্ডার পর্যন্ত কবির কাব্যের তুলনামূলক সমালোচনা করেছেন। ছন্দগঠনে তিনটি জিনিস দরকার—accent, stress, quantity.

এই ধ্বনির মধ্যেই আছে দ্যোতনা ব্যঞ্জনা, মাত্রাজ্ঞান, তার বিস্তার,

তার পড়বার বিশেষত্ব। সেই জন্যই শ্রীঅরবিন্দ বললেন—If we are to get a true theory of quantity, the ear must find it. এই কানের এই শ্রবণের অভিজ্ঞতাই শেষ পর্যন্ত কাব্যে চরম না হোক প্রধান হয়ে দাঁড়ায়, কারণ "It is the rhythm that brings out the concealed feeling."

॥ বারো ॥

দুই মহাকবিই দেখছেন নিত্যনূতনের লীলা।

ললাটের চন্দ্রালোকে (শ্রীঅরবিন্দের "In the Moonlight কবিতাটি দ্রষ্টব্য) নন্দনের স্বপ্ন চোখে,

দেখেছিনু সুন্দরের অন্তর্লীন হাসির রঙ্গিমা
দেখেছিনু লজ্জিতের পুলকের কুণ্ঠিত ভঙ্গিমা
রূপতরঙ্গিমা।

কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন। এর মিল ও বিভেদ কোথায় তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'উর্বশী'। কালিদাস, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, এই তিন মহাকবিই উর্বশীকে এঁকেছেন।

উর্বশীকে নিয়ে যুগে যুগে কবিরা কাব্য লিখেছেন। ঋক্‌যুগে বৈদিক কবি তাকে মখোনী রিতাবরীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। শতপথ ব্রাহ্মণে এক উর্বশীর দেখা পেয়েছি, মহাভারতে পুরাণে আর এক রূপসীর, উষসীর। সংস্কৃত সাহিত্য যুগে যুগে আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে যে নারী শুধু মদনমদালসা সুরতোৎসবের অভিসারিকা নয়, সে—

তড়িল্লেখা তন্বী তপনশশী বৈশ্বানরময়ী

তার মধ্যে বিদ্যুতের ঝিলিক আছে, সূর্যের তেজ আছে, চন্দ্রের স্নিগ্ধতা

আছে, আর আছে আগুনের দাহ। সব মিলিয়ে সে বিধুরা, সে মধুরা, সে প্রিয়া, সে জায়া, সে শুধু নারী বা মায়া নয়, ছায়া বা কায়া নয়, সে মা-ও।

কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ সবাই সেই অপরূপাকে বন্দনা করেছেন—এই তিন মহাকবির দৃষ্টিতে উর্বশী কি রূপ নিয়েছে সেই কথারই সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে।

যৌবনে সব কবিই অল্পবিস্তর কামনাবেগ-নির্ভর, প্রেমের রূপ তাঁদের কাছে তীব্র, তপ্ত, সোচ্চার, সাহসী, ভোগলিপ্সু। তবু কবি-মানসের ধারা অনুসারে একটি অব্যক্ত আকুলতা, সুনিবিড় আকাঙ্ক্ষা, সুনিষ্ঠ কামনারও পরিচয় পাই, যা দেহাশ্রয়ী অথচ দেহগণ্ডীর বাইরে। রবীন্দ্রনাথ বলতেন—স্ত্রীপুরুষ পরস্পরকে যে প্রার্থনা করে তার মধ্যে এই অতিরিক্ত গভীর আহ্বানটির দাবিও কম নয়। চারুদত্তের মত শ্রদ্ধার যোগ্য গৃহস্থ পুরুষের বসন্তসেনার সঙ্গ যে হেয়, একথা সেদিনের কবি কোথাও আভাস দেননি। উর্বশীর কথা বলতে গিয়ে নম্র হয়েছেন কবি কালিদাস, কবি রবীন্দ্রনাথ, কবি শ্রীঅরবিন্দ।

তাই কবি গাইলেন

অগণিত শিশির বিন্দু যেমন্ জ্বলে তেমনি নাচে
মেনকা মিশ্রকেশী মল্লিকা
রম্ভা, নীলাভা, শীলা, নলিনী
ললিতা, লাবণ্য, তিলোত্তমা

(শ্রীঅরবিন্দ)

এরাই রবীন্দ্রনাথের নাম্নীর দল নাগরী ঝামরী পিয়ালী দিয়ালীরা, যারা ভালোবাসে, কাঁদায়, নূতন ধাঁধায় চমকিয়ে দেয়, আলোআঁধারে সংশয়ও বাধায়, আবার অনায়াসগৌরবের সিংহাসনে বসে মৃদু হেসে প্রেমের সহস্রদীপও জ্বেলে দেয়।

কবির ভাষায় এরা শোভনিকা, শিল্পনিপুণিকা, নৈতিক পণ্ডিতদের

ভাষায় কুলটা গণিকা; রুদ্রভট্ট নামকরণ করলেন সামান্যা, তবু শ্রীঅরবিন্দ রবীন্দ্র কালিদাস সেক্সপিয়র কীটস্ গ্যয়টের হাতে এঁরা মাঝে মাঝে অসামান্যাও বটে। প্রাচীন গ্রীসেও এঁদের দেখেছি। ভিনাস পূজার উৎসবে বিবসনা ফ্রাইন্ অভিনয় করছেন, চিত্রশিল্পী অ্যাপেলস তাঁর ছবি আঁকছেন, প্রস্তরশিল্পী প্রাকসাইটেলেস তার মোহিনীমূর্তি গড়ছেন। পেরিক্লিসের প্রিয়তমা অ্যাসপেসিয়া দর্শনশাস্ত্রের বক্তৃতা দিতেন—সক্রেটিসের মত জ্ঞানী তার সমজদার। লেইস্, ডেমস্থিনিস ও ডায়োজিনিসের সঙ্গে তর্কও করছেন, প্রেমও করছেন। ভাবুক ক্রোটসের অঙ্কশায়িনী হিপারশিয়া বড় লেখিকা। থিয়োডট্ সক্রেটিসের, লিওন টিয়াম এপিকিউরাসের সঙ্গিনী; রূপসী রেখিসের মৃত্যুতে গ্রীক সাহিত্যে যে শোকোচ্ছ্বাস উঠেছিল তা পৃথিবীর রসসাহিত্যের এক অপূর্ব সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ বলতেন মানুষ আপনার সৃষ্টি দিয়ে নিজেকে উদ্‌ভ্রান্ত করবার উপকরণ বিশ্বের রহস্যলোকে অন্বেষণ করে—

নাম দিয়ে ভাব দিয়ে
মনগড়া মূর্তি রচে তারি
যাহা পায় তার সাথে যাহা নাহি পায়
তাহারে মিলায়
উপমা তুলনা যত ভিড় করে আসে
ছন্দের কেন্দ্রের চারিপাশে।

সে রহস্য শুধু পুরুষ নারীর কাছে নয়, নারী পুরুষের কাছে নয়, দুজনে প্রকৃতির কাছে।

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিণী

আত্মসংঘাত মদিরা দু'চার রাত্রিতে জীবনপাত্র পূর্ণ করবার প্রয়াস করতে পারে কিন্তু সেই অচপলদামিনীর মৌন মহিমাকে, উষালোক সম অসীমাকে ধরতে পারে না।

নরনারীর আদিরসকে আশ্রয় করে বিলাসের বর্ণনা সব কাব্যেই সুপ্রচুর। তার শৃঙ্গার কামকেলিকৌতুকও কাব্যে অপরিচিত নয়। কালিদাসের মত কবি কুমারসম্ভবের মত কাব্যেও এর লোভ সামলাতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দেও পেয়েছি বর্ণাঢ্য কামরসসমৃদ্ধ বর্ণনা ; কিন্তু এই তিন কবিই আশ্চর্যরকম সংযম দেখিয়েছেন উর্বশী কল্পনায়, তিনজনেই ঊর্ধ্বের মানসযাত্রী, তাঁরা একই উর্বশীকে তিন রূপে দেখেছেন, কাব্যে রূপ নিয়েছে এক অপরূপ মানসলোক-বিহারিণী। কুমারসম্ভবে দেখেছি ধ্যানস্থ মহাদেব 'আত্মানং আত্মনি অবলোকয়ন্' 'অন্তং পরমাত্মসংজ্ঞং পরং জ্যোতির্দৃষ্ট্বা' বীরাসন শিথিল করে নেত্র উন্মীলন করলেন ও দেখলেন সামনে আসছেন পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিনী পল্লবিনী লতার মত বিশীর্ণক্রমা উমা। যোগীশ্বরের মন চঞ্চল হয়নি যে তা নয়, কবি দেখালেন সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু তার জৈবিক দিকটার চেয়ে বড়ো হলো আত্ম আলোড়নের দিক, Dialectic process-এর দিক—তাই কাম ভস্মীভূত হল বটে—কিন্তু সে পাবক প্রেমেরই পাবক—বিশ্ব মাঝে যে ছড়িয়ে থাকে। চক্রীকৃত চারু চাপের চক্রান্তই শুধু ব্যর্থ হয়—জীবনের চক্র নয়—তার ঘূর্ণী অব্যাহত—যাওয়া, আসা, চাওয়া-পাওয়া-দেওয়া-নেওয়ার মাঝে মদনের ভস্মাবশেষের মধ্যে নবজন্মের স্বীকৃতি তিনি দিলেন—নব কুমার-সম্ভবে। আদিরসের পিছনে এলেন আদিমতম যিনি। কাব্যের সার্থকতা এইখানে। প্রেমের অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্তির জন্যই কবিরা মন্ত্র জপ করছেন, ভস্ম অপমান শয্যা ছেড়ে পুষ্পধনুকে রুদ্রবহ্নি হতে জ্বলদর্চি তনু নিয়ে জাগতেই হবে, মৃত্যুর হাত হতে অমৃতত্বকে ছিনিয়ে নিতেই হবে—এইতো মানুষের প্রেমসাধনা—তার প্রতীক সাবিত্রীই হোক্ নচিকেতাই হোক্ রুরুই হোক্। আজকের কবির সাধনাতেও তারই সুর শুনি।

কালিদাস, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথের উর্বশী-চিত্র আলোচনা করলে এই মূল সত্যেরই কিছুটা সন্ধান পাই।

কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকের প্রথমেই সূত্রধার জানিয়ে দিলে যে উর্বশী কুবেরপুরী থেকে ফিরছিলেন এমন সময় অসুররা তাকে হরণ করে।

কৈলাসনাথমুপস্থৃত্য নিবর্তমানা বন্দীকৃতা বিবুধশত্রুভিঃ, সখীরা ক্রন্দন করে উঠলো। রাজা পুরুরবা তখন ঐখান দিয়ে আসছিলেন। তাঁর টনক নড়লো, তিনি 'ঐশানীং দিশং প্রতি' আশু গমন করলেন এবং উর্বশীকে উদ্ধার করে হেমকূট পর্বতশিখরে ফিরিয়ে দিয়ে এলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বন্দী হয়ে গেলেন। কালিদাস উর্বশীকে চিত্রিত করেছেন প্রেমময়ী পরমা সুন্দরী মনোহারিনী রূপে।

অস্যাং সর্গবিধৌ প্রজাপতিরভূচ্চন্দ্রো নু কান্তিপ্রদঃ
শৃঙ্গারৈক রসঃ স্বয়ং নু মদনো মাসো নু পুষ্পাকরঃ
বেদ্যাভ্যাস জড়ঃ কথং নু বিষয়ব্যাবৃত্তকৌতূহলো,
নির্ম্মাতুং প্রভবেন্মনোহর মিদং রূপং পুরাণো মুনিঃ

কবি বললেন—এই লোকললামভূতা নারী কখনই বেদভ্যাসজড় ভোগবিমুখ ঋষির সৃষ্টি নয়—ইনি কান্তিমান চন্দ্রের, শৃঙ্গাররস প্রধান মদনদেবের বা মধুমাসের সৃষ্টি হবেন। কবির প্রথমদৃষ্টি—সাধারণ রূপজ মোহের দৃষ্টি—কিন্তু একে অতিক্রম করলেন কবি কালিদাস যখন তাকে তিনি সাধারণী মানুষী পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে এসে উর্ধ্বে তুলে দিলেন। তার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের কথায় দ্যুলোকের আবহাওয়া আছে, সুদূরের জ্যোতি আছে, অবাধ বাতাসের মুক্ত নিঃশ্বাস আছে কিন্তু সেগুলো তার সত্তার অচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়। সে সখী, সে সহোদরা, সে প্রিয়া, সে জায়া, সে জননী। সে স্বর্গের কামনাকেন্দ্রের নেত্রী নয়, সে অপ্সরা নয় 'অনপ্সরের মে প্রতিভাসি'—সে মানুষী, সে প্রেমিকা, দুর্বৃত্ত হরণ করলে সে মূর্ছা যায়, সে বলে

সখি, মা খলু, মা বিস্মর—
আমাকে ভুলে যেয়োনা—সব চেয়ে বড়ো কথা সে মা
পুত্ত মে আউ—আমার ছেলে আয়ু—
মাতৃস্নেহে সে গরবিনী
স্নেহ প্রস্নুবিনীভিন্নমুদ্বহন্তী স্তনাংশুকম্—

শ্রীঅরবিন্দ কালিদাসের বিক্রমোর্বশীর (The Hero and the Nymph) শুধু অনুবাদই করেননি, ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে উর্বশীকে নিয়ে তিনি একটি নাতিদীর্ঘ চারিটি সর্গে বিভক্ত কাব্যও রচনা করেন। শ্রীঅরবিন্দ মূলতঃ কালিদাসের উর্বশীকে গ্রহণ করলেও তাঁর 'উর্বশী' কাব্যে উর্বশী পুরুরবার প্রেম-আখ্যানকে নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতের ঊর্ধ্বে এক মহাকাব্যীয় স্তরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। কামায়ন প্রচুর বর্ণনা আছে বটে যেমন—

She, o'er borne
Panting, with inarticulate murmurs lay
... ...
Amid her wind-blown hair their faces met
With her sweet limbs all his, feeling her breasts
Tumultuous up against his beating hearts
He kissed the glorious mouth of heaven's desire
So clung they as two ship-wrecked in a surge.

উর্বশী সে
রতিভারে প্রপীড়িতা তনুর আলসে
মদনের মদবিহ্বল মাধুর্য রভসে
রহিল পড়ি
বাক্য স্খলিত, ভাষ গদগদ
মৃদু পবনের দোদুল দোলাতে
চূর্ণ অলকে কুন্তলে

দুইটি আরক্ত মুখচন্দ্রিমা
আতপ্তঘন
মিলিল বিধির বিধানে
কনককান্তি দেহবল্লরী,
সঙ্গে সঙ্গে লাগিল পরশ
সরস দেহাগ্রচূড়ায়,
কম্প্র হিয়া কাঁপিল দুরুদুরু
রমণীর রমণীয় ধমনীতে
নমনীয় জোয়ারের স্রোতে
স্বর্গের ঈপ্সিতা কামনায়
মর্ত্যের মাটির মানুষ করিল আলিঙ্গন ;
তরঙ্গমুখর মহাসমুদ্রের মাঝে
ভগ্নপোতে নিরালম্ব যেন দুটিজীব
পরস্পরকে গভীরে আঁকড়ি
মাগিছে আশ্রয় দোহে দোহাঁমাঝে।

কবি কিন্তু এখানেই থামলেন না—দেহের অনুতে অনুতে, অঙ্গের প্রতিটি ভঙ্গীতে, কামনার প্রতিটি স্তরে যে মিলনের সূত্রপাত তাতেই যদি তার পরিসমাপ্তি হয় তাহলে সে মিলনের সার্থকতা হয়তো নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে—কিন্তু সমষ্টিগত জীবনে সে দুঃখের বেদনাই বহন করে আনে, তাই প্রেমকে ঊর্ধাশয়ী হতে হবে, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে থাকলে চলে না। আত্মতর্পণকে কেন্দ্র করেই বিশ্বতর্পণে যেতে হয়। তাইতো দেবতারা অধীর হয়ে উঠলেন—মেনকাকে বললেন, যাও, উর্বশীকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো—

How long shall one man
Divide from heaven its most perfect bliss
Go down, bring her back.

উর্বশী ফিরে গেলেন, পুরুরবা বিরহব্যথায় অধীর হয়ে উঠলেন। তিনি কৈলাসে তপস্যামগ্ন হয়ে মহাশক্তির আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন—

He understood infinity and saw
Time like a snake coiling among the stars.

সময় চলেছে নিশীথিনী তারার মধ্য দিয়ে সাপের মত একে বেঁকে। মানবসত্তা পুরুরবা তপস্যায় সিদ্ধ হলেন, গন্ধর্বলোকে উঠলেন, মহামায়ার শক্তিকে জানলেন, তার কাম্যকে পেলেন কিন্তু এ তার ব্যক্তিগত সাধনা।

But far below through silent mighty space
The green and strenuous earth abandoned rolled

এই 'abandoned' কথাটি দিয়ে কবি ও সাধক শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কাব্য ও সাধনার এক সমন্বয়-সূত্রকে ধরিয়ে দিলেন। সাধনায় ইহলোককে ত্যাগ করে উর্ধ্বে উঠা যায় কিন্তু সেইটাই সাধনার শেষ কথা নয়, কাব্যেরও নয়। তারই Epilogue 'সাবিত্রী'।

With recognition of an altered world
............So woke Urbasie to love.

সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক ও সুধী শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার বলছেন—

"Urvasie is the work of a youngman; it has youth's boldness, idealism, intuition of romantic imagery and feeling for the sheer beauty of language. It is Sri Aurobindo's Endymion; but an Endymion transferred by sleight of hand to Aryasthan and rendered in terms of immemorial Hindu thought."

শ্রীঅরবিন্দের কাছে উর্বশী রূপান্তরিতা দেবী

A goddess won to mortal arms

He, of her beauty world desired took joy
And all earth's silent sublime spaces passed
Into his blood and grew a part of thought.

বিশ্বের নীরব মহিমান্বিত চেতনা মানবসত্তায়, তার রক্তে, তন্ত্রীতে, তন্ত্রে সঞ্চারিত হয়ে গেলো, সেই প্রেম মানসমহিমার অঙ্গ হয়ে উঠলো।

রবীন্দ্রনাথের উর্বশী আর এক অপূর্ব কল্পনা। সে কন্যা নয়, বধূ নয়, মাতা নয়, সে সুরসভাতলে নৃত্য করে, নূপুর গুঞ্জরি চলে যায়, আকুলঅঞ্চলা বিদ্যুৎচঞ্চলা হয়। তার চরণ শোণিমা ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা, দ্বিধায় জড়িত পদে স্তব্ধ অর্ধরাতে সে সলজ্জিত বাসর শয্যাতে যায় না। কালিদাসের কাছে, শ্রীঅরবিন্দের কাছে, রবীন্দ্রনাথের কাছে উর্বশী সূর্যালোকের দীপ্তির মত, উষার রক্তিম আভার মত, সমুদ্রের কলকণ্ঠের মত, বিদ্যুৎচমকের মত অর্থাৎ তিন মহাকবিই তাকে যৌবনের, সৌন্দর্যের, শোভনতার প্রতীক রূপেই গ্রহণ করেছেন, কিন্তু কালিদাস তাকে বিকশিত কামনার বিশ্ববাসনার ঊর্ধ্বে নিয়ে গেলেন মাতৃত্বের মূর্তি দিয়ে, মানসী হলো মানুষী। শ্রীঅরবিন্দ সেই অনবগুণ্ঠিতাকে অকুণ্ঠিতা করলেন দেবীত্বের মর্যাদা দিয়ে অর্থাৎ তাকে প্রকৃতরূপে পেতে হলে তপস্যার পর পেতে হয়। রবীন্দ্রনাথের উর্বশী চিরপ্রেমিকা, সাংসারিক সম্বন্ধের অতীত, সে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী নয়, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী নয়,—স্বর্গের নর্তকী, দেবলোকের অমৃত পান সভার সখী। দেবতার ভোগ কিন্তু নারীর মাংস নিয়ে নয়, সৌন্দর্য নিয়ে, চিরযৌবনের পাত্রে তপের অমৃতকে নিয়ে। সে অখিল মানস স্বর্গে অনন্তরঙ্গিনী, তাকে ধরা যায় না, কিন্তু সেই অধরাকে ধরার খেলায় সবাই মত্ত, জীবনের জৈব নিয়মই এই। তাই রবীন্দ্রনাথের উর্বশী সৌন্দর্যলক্ষ্মী হলেও তার ডানহাতে সুধাপাত্র বামকরে বিষভাণ্ড—

ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরবশশী
অস্তাচলবাসিনী উর্বশী

তবু আশা জেগে থাকে, দূরস্মৃতি চঞ্চল করে, অশ্রুরাশি ঝরে। শ্রীঅরবিন্দের উর্বশী পৃথিবীকে 'abandon' করে গেলেও

She is but gone, for a little gone
But she will soon come back—even if her heart
Would let her linger, mind would draw her back.

গন্ধর্বলোকে উর্বশীকে ফিরে পান পুরুরবা তপস্যার বলে। কালিদাসের উর্বশী সে অসুলভা, সকলেন্দুমুখী হলেও দেবরাজের কৃপায় পুরুরবার যাবদায়ুস্তে ধর্মচারিণী হয়ে মানুষী মদনবেদনাকে জয় করে মাতৃত্বের গৌরবে, সহধর্মিণীর মহিমায়। তাই ভরত বাক্যে শুনি

সর্বস্তরতু দুর্গাণি সর্বো ভদ্রানি পশ্যতু
সর্বঃ কামানবাপ্নোতু সর্ব সবত্র নন্দতু

সকলে সঙ্কট থেকে উদ্ধার লাভ করুক, সকলের কল্যাণ হোক্, সকলে সকল স্থানে আনন্দ পাক। কালিদাস তাকে জননী করে উর্ধে তুলে দিলেন মানুষী মহিমায়, শ্রীঅরবিন্দ তাকে বহুর মধ্য থেকে উদ্ধার করে একের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন তপস্যায়, রবীন্দ্রনাথ তাকে বহুর অনুভূতিতে বিশ্বের মাঝে ছড়িয়ে দিলেন সৌন্দর্যের সুধায়—পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর সবই উর্বশীর প্রেরণা।

"প্রেম ও মৃত্যুতে" মৃত্যু এলো ভোগের পরিপূর্ণ ভূমিতে।

In the woodland of the bright and early world when love was to himself yet new and warm and stainless...

Ruru with his young bride opened her budded heart of crimson bloom to love.

সকাল হয়েছে, আকাশে প্রথম আলোর আভা, বসুন্ধরা দীপ্ত মনোহর, প্রেম তখন নবীন মদনের আকুলতায় তপ্ত—নববধূ সনে রুরু-আসীন, যেন আবেগের প্লাবনে হিল্লোলিত নর্তনচঞ্চল একটি শতদল—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

সেদিন ফাগুন মেতে উঠেছিল মদবিহ্বল শোভাতে
সঙ্গে সঙ্গে রুরু ও প্রেমদ্বরা বা প্রিয়ম্বদাও,
তোমাতে আমাতে রত ছিনু যবে কাননে কুসুম চয়নে
ঘুম এলো মোর নয়নে

কিন্তু প্রেমদ্বরার সে ঘুম আর ভাঙলো না—অকালে কালসর্প করলে দংশন। বিরহী রুরু ছুটলেন মৃত্যুর পিছনে—প্রিয়াকে ফিরে পাবার জন্য, কবি বললেন— রাগমুগ্ধ হে অন্ধ প্রেমিক, পারিবে না প্রবোধিতে নয়ন সলিলে কৃতান্ত দেবেরে, চাহে শুধু একবস্তু দেবগণ জীবিত মানব কাছে,—Sacrifice—বলিদান—

আত্মদানই করলেন রুরু—দিলেন আয়ুর অর্ধভাগ। মৃত্যু পরাস্ত হলেন সেই উগ্র প্রেমের কাছে, কিন্তু এ তার আংশিক পরাজয়। নচীকেতা তাকে পরাস্ত করেছেন উদগ্র অভীপ্সায়, সাবিত্রী তাকে পরাস্ত করলেন পরিপূর্ণ প্রেমে—এইখানেই তাঁর পূর্ণ পরাজয়।

॥ তেরো ॥

সৃষ্টির অজস্রতায় ও বৈচিত্র্যে এই যুগে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই শ্রীঅরবিন্দের তুলনা চলে।

'Songs to Myrtilla' ছাড়াও এ সময়ের অরবিন্দসাহিত্যে 'Urvasie', 'Love and Death', 'Perseus the Deliverer' বিখ্যাত। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে বেদ উপনিষদ পাঠ, ভর্তৃহরির নীতি-শতকের, কালিদাসের বিক্রমোর্বশী ও মেঘদূতের, চণ্ডীদাসের প্রেম-কাব্যের অনুবাদ। বাংলা ইংরাজী সংস্কৃত গ্রীক লাতিন ফ্রেঞ্চের অপূর্ব রসায়নে বিদগ্ধ কবিমানস অবিরাম সৃষ্টি করে চলেছে—এ সৃষ্টি সাধনারই অঙ্গ—বিচিত্রকে প্রকাশ করছে একমুখী হয়ে, অনন্য হয়ে,

তন্মনা হয়ে, তদ্‌যাজী হয়ে—এও যজ্ঞ। এই কবিক্রতু হোতা-ই আবার কংগ্রেস রাজনীতিকে বিশ্লেষণে দগ্ধ করছে, বঙ্কিম-মানসকে পুনরুজ্জীবিত করে নতুন করে দেখাচ্ছে—গভীরতম চিন্তায় আলোড়িত হচ্ছে।

Perseus the Deliverer-এ গল্পের আখ্যানভাগ এই যে, রাজা Acrisus দৈববাণীতে জেনেছিলেন যে তার কন্যার পুত্রই তাঁকে ধ্বংস করবে, অনেকটা কংসকাহিনীর মত। সেইজন্য মেয়েকে তিনি আবদ্ধ করে রাখলেন নির্জন দুর্গে, কিন্তু স্বর্গের অধিপতি জিউস্ অবতরণ করলেন সেই কারাগারে এবং সেই মিলনের ফলে জন্ম নিলেন পার্সিউস্। কন্যা পুত্র প্রসব করেছে জেনে ক্রুদ্ধ নরপতি কন্যা ও দৌহিত্রকে অকূল সমুদ্রে কাণ্ডারীহীন পালহীন তরণীতে ভাসিয়ে দিলেন। সে যাত্রাও তারা বেঁচে গেলো এবং আশ্রয় পেলে সেরিপস্ দ্বীপের অধিপতির কাছে। পার্সিউস্ যখন বড় হলো তখন তার পালক-পিতা তার মাতাকে বিবাহ করতে উৎসুক হলেন এবং পার্সিউস্‌কে পাঠালেন গর্গন মেডুসাকে বধ করতে। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর বীরত্বের প্রকাশ হলো এবং শেষ পর্যন্ত সিরিয়ারাজের কন্যা এণ্ড্রোমেডাকে বিবাহ করলেন তিনি, সমুদ্রদেবতা পসিডনের বিরোধিতা করে।

গল্পের ছায়া পুরাতন গ্রীসের কাহিনী যাকে heroic myth বলা যেতে পারে কিন্তু কবি শ্রীঅরবিন্দের হাতে ইহা রূপান্তরিত হয়ে শুধু এলিজাবেথান যুগের রোমান্টিক নাটকেই পরিণত হয়নি, এর মধ্যে দেখি "first promptings of the deeper and higher psychic and spiritual being which it is his (man's) ultimate destiny to become." অর্থাৎ মানুষের জীবনে সবশেষের পরিণতি যে উর্ধতর গভীরতর আধ্যাত্মিক চৈত্য জীবন, তারই সূচনা Perseus the Deliverer-এ। নাটকের আরম্ভে Prologue-এর Pallas

Athene (বা সৌন্দর্যের দেবী) ও পসিডনের বাক্যালাপেই কবিত্বময় ভাষায় এর ইঙ্গিত। তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত মহাসাগর—উর্মিমুখর ব্যগ্র ভীষণ—মহাঝটিকার আবর্ত—দেবী এসে দাঁড়ালেন আকাশে, বিদ্যুৎমেখলা, তড়িতচঞ্চলা—আলুলায়িত কুন্তলা—অশান্ত সমুদ্রকে স্তব্ধ করে দিয়ে তিনি বললেন

হে পসিডন্, তুমি জাগো, জাগৃহি, ওঠো

সমুদ্রের বহুনিম্নে নিদ্রিত পসিডন্ জেগে বললে—

কে আমাকে ডাকে

জলধির কলনাদে উত্তর এলো—

A whiteness and a strength is in the skies

উর্ধে আবির্ভাব হয়েছে এক শুভ্রাশক্তির

তুমি কে···জিজ্ঞাসা করে পসিডন্

আমি—

Me the Omnipotent
Made from His being to lead and discipline
The immortal spirit of man, till it attain
To order and magnificent mastery
Of all his outward world.

আমি পরমশক্তিমানের সৃষ্টি—মানবের অমর আত্মাকে আমি ঠিক লক্ষ্যে নিয়ে যাই—যেন সে এই দৃশ্যমান সমস্ত বহির্জগতের অধীশ্বর হতে পারে।

তাই নাটকের শেষে পার্সিউস্, জিউস্ ও এথেনার নামে মন্দির উৎসর্গ করতে বলছেন, কারণ দেবশিশু পার্সিউস্ এসেছিলেন এই পৃথিবীকে বদলে দিতে

'Thou comest to change our world for us'

তিনি যুদ্ধ করেছিলেন নীচের অসুরদের সঙ্গে

But the blind nether forces still have power
And the ascent is slow and long is time.
Man most must change who is a soul of time
His gods too change and live in larger light
Then man too may arise to greater heights...

স্পষ্টভাবে কবি শ্রীঅরবিন্দ সেই ঊর্ধ্বজগতের কথা ভাবছেন, তার মন্দির প্রতিষ্ঠা করছেন, শুধু-মানুষ বদলাবে না, দেবতারাও বৃহত্তর আলোকের পরিপ্রেক্ষিতে বদলে যাবে। কারণ All alters in a world that is the same, এই স্থিতিমান জগতে একদিক থেকে দেখলে সব কিছু বদলায়—আর আর একদিক থেকে দেখলে কিছুই বদলায় না—হেগেলিয়ান দ্বন্দ্বের মধ্যে Being, Becoming-এর ছন্দ ঘুরছে। প্যালাস্ এ্যাথিনি জ্ঞানের দেবী, পসিডন্ সমুদ্রের দেবতা—সে জীবনকে তরঙ্গময়, ঝটিকামুখর, বেদনাক্ষুব্ধ করেই তোলে, জ্ঞানের আলোকে তাকে শুভ্রজ্যোতির্ময় করে না। কবি এই বিরোধের মধ্যেই নাট্যের মূল সুরটিকে ধরেছেন—নাটকটি Poetic drama। শ্রীঅরবিন্দের এই নাটকটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন'কে কিছুটা তুলনা করা যায়। রঘুপতি আর পলিয়াডন্ এক নির্মম দেবতার উপাসক—জয়-সিংহ আর পার্সিউস্, অর্পণা ও এণ্ড্রোমেডা তারই বলি। My victims, Polyadon, give me my victims—এ 'যেন ম্যয় ভূখা হুঁ'

মহাকালী কাল স্বরূপিনী, রয়েছেন
দাঁড়াইয়া তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলি—
বিশ্বের চৌদিক বেয়ে চির রক্তধারা
ফেটে পড়িতেছে, নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা হতে
রসের মতন অনন্ত খর্পরে তাঁর

কিন্তু শুভ্রাশক্তির নিকট রুদ্রাশক্তির শেষ পর্যন্ত হার হয়ই। জয়-সিংহের আত্মদানে আত্মচেতনা লাভ হয় রঘুপতির—মা অমৃতময়ী এ উপলব্ধি আসে।

ফিরে আয়, ফিরে আয়···ফিরে দে।

নাটক হিসাবে "পরিত্রাতা পার্সিউস" বাঙ্ময় ও বলিষ্ঠ হলেও নাটকের কারুকলার দিক থেকে 'বিসর্জন' আরো আবেগময়, ঐশ্বর্যময় ও কারুকার্যময়, কিন্তু মূল তথ্য হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ গভীর তত্ত্বে প্রবেশ করেছেন এবং তারই আর এক অন্য প্রতিধ্বনি শুনি 'বিসর্জনে'-এ।

রবীন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দ কাব্য আলোচনা করলে মনে হয় শ্রীঅরবিন্দ ব্যাস ও বাল্মীকির মধ্যে যে মূল প্রভেদ দেখেছিলেন এখানেও আমরা তার কিছুটা দেখি। একজনের কাছে "heart ও imagination." বড় আর একজনের কাছে "intellect ও experience"। একজন সূক্ষ্মবর্ণের চিত্রশিল্পী আর একজন গথিকস্থপতি। শ্রীঅরবিন্দের শিল্পচাতুর্য ব্যাসের মত মহৎ ও উঁচুদরের "but it unfitted him as a similar spirit unfitted the Greek to voice fully the outward beauty of nature for to delight infinitely in nature one must be strongly possessed with sense of colour and romantic beauty and allow the fancy equal rights with the intellect."

রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ এই দলের—রং, রোমান্স ও অনুপম কল্পনা তাঁর কাব্যকে সুষমায় মণ্ডিত করেছে। শ্রীঅরবিন্দকাব্যে fancyর স্থান অল্প। শ্রীঅরবিন্দ ব্যাসের মত নিষ্কাম কর্মের কবি। সেখানে একটা strong, purposeful, artistic synthesis আছে আর রবীন্দ্রনাথে আছে "marvellous and revealing touches. ব্যাসের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক কোথায় শ্রীঅরবিন্দের নিম্নলিখিত উক্তিতেই বোঝা যায়। "Similarly in the Savitri, what a tremendous figure a romantic poet would have made of death···But Vyasa would have none of this. He had one object to paint, the power of a woman's silent love and he rejected everything which went beyond this or which would have been merely

decorative. We cannot regret this choice. There have been plenty of poets who could have given us imaginative and passionate pictures of love struggling with death but there has been only one who could give us a Savitri."

ব্যাসের সাবিত্রী তাই তাকে শুধু মুগ্ধ করেনি, অভিভূতও করেছিল এবং তিনি নিজে তাকে ভাবরসে সমৃদ্ধ করে, সাধনলব্ধ রূপ দিয়ে, তপস্যাপূত চিত্র এঁকে অপূর্বভাবে প্রকাশ করলেন যা এক মহাসম্পদ হয়ে রইলো। পূর্ণদৃষ্টিতে থাকে অতীতের সমাহার ও সমন্বয় আর অনাগতের ইঙ্গিত। রবীন্দ্রকাব্যে যার ছায়া দেখেছি, অরবিন্দকাব্যে তা সুস্পষ্ট। তাই দুই কবির কাছেই মৃত্যু ও অমৃত যে একই—যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যু—রবীন্দ্রনাথ বললেন—

মহাসম্পদ তোমারে লভিব সব সম্পদ খোয়ায়ে
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে

মৃত্যু এখানে অনুভূতির তীব্রতায়, রসের সাধনায় রূপান্তরিত। মরণ রে তুহুঁ মোর শ্যাম সমান। আর শ্রীঅরবিন্দে শুধু সমান নয়, একেবারে মৃত্যু আর অমৃত একাত্মীভূত।

I shall not die,
Although this body, when the spirit tires
Of its cramped residence, shall feed the fires
My house consumes, not I.
Together and upbear the teeming earth,
I was the eternal thinker at my birth
And I shall be though I die.

আমি মরিব না, আমি মৃত্যুহীন,
যদিও জানি—একদিন
ক্লান্ত দেহলীর সীমিত দিগন্ত ছাড়ি
আমার শ্রান্ত সত্তা দিবে পাড়ি

অগ্নিভোজ্য হবে এ নিকেতন,
বহ্নিমালিকার উৎসব আভরণ
সে আমি কিন্তু আমি ত নহি
যে আমি জড়ায়ে রহি, বাতাসে বহি
তুলিয়া ধরি অম্বরে
পৃথ্বীর সাথে মিতালীর স্বয়ম্বরে,
যে আমি জন্মদিনেও ধ্যাননিমগ্ন
যে আমি মৃত্যুক্ষণেও রসবিলগ্ন।

সাধক অনির্বাণ তাঁর অপরূপ ভাষায় যোগসমন্বয় প্রসঙ্গে যে কথা বলেছেন কাব্যবিচারেও সে কথা বলা যায়—পৃথিবীকে ভুলে গিয়ে কেউ শুধু সূর্যকে দেখল, তার সূর্যদর্শন নিশ্চয় সত্য। কেউ সূর্যের আলোকে পৃথিবীকেও দেখল, তাঁর সূর্যদর্শন কিন্তু সত্যতর। আর যে পৃথিবীর অনু-পরমাণুতে সূর্যের তেজস্ক্রিয়াকে অনুভব করল, তার সূর্যদর্শন সত্যতম।

মহাসাধক মহাকবি শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্মিক পরিচয় তাই ক্ষীণ নয়। কাব্যজগতে তাঁরা অল্পবিস্তর এক পথের পথিক—**a way farer towards the same goal.**

॥ চৌদ্দ ॥

পূর্বেই বলেছি শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় আত্মিক পরিচয়ের যুগ—স্বদেশী আন্দোলনের যুগ—দেশাত্মবোধ জেগেছে—দেশমাতা নিজেকে প্রকাশ করেছেন—একটি সত্যকার ভাবসাধনার স্রোত এসেছে—

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন তার অপূর্ব গানগুলি—

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক,
জগৎজনের শ্রবণ জুড়াক,

হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক
মুখ তুলে আজি চাহরে
...　　...　　...　　...
তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ,
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে
এ বীণা তোমারি গাহিবে গান।
...　　...　　...　　...
আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে
তোমার দুয়ার আজ খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।
...　　...　　...　　...　　...

এ শুধু ভাবগঙ্গায় বন্যাই নহে—দেশের মাটি তখন সকল-সহা সকল-বহা মাতার গৌরব পেয়েছে, সে চিরকল্যাণময়ী, দেশবিদেশে অন্ন বিতরণ করে। যে তার পূজারী, তাকে হতে হবে সাধক বীর্যবান মধুমান পুরোহিত।

নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন হবেই হবে
যদি সত্যিকারের পণ করে থাকিস,
সে পণ রবেই রবে।

শুধু বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি—

আমাদের যাত্রা হল সুরু এখন, ওগো কর্ণধার
তোমারে করি নমস্কার
এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরবো না গো আর
তোমারে করি নমস্কার।

কি ফল হবে—

তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে
তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না

তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে
হয়তো রে ফল ফলবে না—

এ ছাড়া আরো কতো গান কবিতা প্রবন্ধ স্মরণ করিয়ে দিচ্চে সেদিনকার সে অবিস্মরণীয় ভাবমাধুর্যকে, বীর্যে শৌর্যে প্রতিফলিত করে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে—ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন খুলবে মোদের—প্রভৃতি গানে বাংলার মাটি বাংলার জল, শুধু ধন্য আর পুণ্যই হয়নি, অপূর্ব সার্থকতায় ভরে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলি—একদিন চৈতন্য আমাদের বৈষ্ণব করেছিলেন সেই বৈষ্ণবের জাত নেই কুল নেই—আর একদিন রামমোহন রায় আমাদের ব্রহ্মলোকে উদ্বোধিত করেছেন—সেইব্রহ্ম-লোকেও জাত নেই দেশ নেই। বাংলাদেশের চিত্ত সর্বকালে সর্বদেশে প্রসারিত হোক্, বাংলাদেশের বাণী সর্বজাতি সর্বমানবের বাণী হোক্। আমাদের বন্দেমাতরং মন্ত্র বাংলাদেশের বন্দনার মন্ত্রনয়—এ হচ্চে বিশ্বমাতার বন্দনা—সেই বন্দনার গান আজ যদি আমরা প্রথম উচ্চারণ করি তবে আগামী ভাবী যুগে একে একে সমস্ত দেশে এই মন্ত্র ধ্বনিত হয়ে উঠবে। কংগ্রেস কনফারেন্সে তালপাতার ভেঁপু যারা বাজিয়ে বেড়াচ্চে তারা কোনো মতেই বুঝতে পারবেনা আমাদের দেশের সত্যকার সাধনা কি। এর পরের যুগে আর এক সংঘাতের দিনে অসহযোগ আন্দোলনের চরম মূহূর্তে ভারতপুরুষ গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ যখন আদর্শের কথা তুললেন তখন কবি (the Great Sentinel) দেশবাসীদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন এক অপূর্ব সত্য—The infinite personality of man can only come from the magnificent harmony of all human races. My prayer is that India may represent the co-operation of all the peoples of the world. মানবসত্তার অনন্ত বিকাশ সর্বমানবের মিলনের পরিপ্রেক্ষনিকায়—আমার অন্তরের গভীরতম প্রার্থনা, ভারতবর্ষ যেন সেই মিলনের পথই বেছে নেয়।

গান্ধীজী কিন্তু আর এক অপ্রিয় সত্যকে সেদিন তুলে ধরেছিলেন—The poet lives for the morrow.—The house is on fire. Men are dying for want of food. My duty is to feed the hungry. The human bird under the Indian sky gets up weaker than when he pretended to retire. For millions it is an eternal vigil or an eternal trance. I have found it impossible to soothe suffering patients with a song from Kabir—কবির গান আগামীকালের জন্য—আজ কিন্তু আমার বাড়ীতে আগুন লেগেছে—লোকে না খেয়ে মরছে—আজ আমার কর্তব্য নিরন্নকে অন্নদান। ভারতের নীলাকাশের নীচে যে মানুষ পাখী উড়ছে সে যে দিনে দিনে দুর্বল হচ্চে—লক্ষ লক্ষ লোক আজ যখন অনন্ত অপেক্ষায় অনন্তনিদ্রার জন্য প্রস্তুত হচ্চে তখন কবীরের গান শুনিয়ে সেই ক্লিষ্ট মানুষকে আমি সান্ত্বনা দিতে পারিনা, সেটা অসম্ভব।

কবির উত্তরও অপূর্ব—Indian's destiny is bound up in Narayana and not in Narayani Sena. Swaraj—Home rule is not really our goal. Our battle is a spiritual battle, a fight for humanity. We must emanicipate men from tho meshes he has woven around him, from tho organisations of national selfishness. We persuade the butterfly that the freedom of the sky is better than the shelter of the cocoon.

ভারতের ভবিষ্যৎ নারায়ণে, নারায়ণী সেনায় নয়। স্বরাজ স্বাধীনতা আমাদের সত্যকার লক্ষ্য নয়। আমাদের যুদ্ধ আধ্যাত্মিক যুদ্ধ—আসল মানুষের জন্য—নিজের চারপাশে নিজের হাতে যে শৃঙ্খল সে গেঁথেছে তা থেকে তাকে মুক্তি পেতে হবে...প্রজাপতিকে বলতে হবে গুটির ভিতর না ঢুকে আকাশের উদার আতিথ্যকে গ্রহণ করো।

তাই বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ মিটিয়েছেন সেই আন্দোলনের aesthetic আর emotional need, শ্রীঅরবিন্দ তার spiritual আর higher need. অন্যের মধ্যে বেশী ভাগই দেখি বিদ্বেষ, স্বার্থান্ধতা বা ভাবোন্মত্ততা। শ্রীঅরবিন্দের কথাতেই বলি—যেদিন বঙ্কিমচন্দ্রের গান বাহ্যেন্দ্রিয় অতিক্রম করে প্রাণে আঘাত করিল সেইদিন আমাদের হৃদয়মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগিল, মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বদেশমাতা, স্বদেশ ভগবান এই বেদান্ত শিক্ষার অন্তর্গত মহতী শিক্ষা জাতীয় অভ্যুত্থানের বীজস্বরূপ। কিন্তু এই মন্ত্রকে ক্রমশঃ অন্তর্মুখী করে নিতে হবে...মাতৃমূর্তি তোমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, তোমরা মাতৃপূজা ও মাতৃসেবা করিতে শিখিয়াছ, এখন অন্তর্নিহিত মাতাকে আত্মসমর্পণ করো—মা তোমাদিগকে যন্ত্র করিয়া এত সত্বর, এমন সবলে কার্য সম্পাদন করিবেন যে জগৎ স্তম্ভিত হইবে'।

শ্রীঅরবিন্দের বৈশিষ্ট্য এইখানে—অন্য কোন দেশনায়কে দেশ-মাতার এই সর্বগ্রাসীরূপ ধ্যানে এসেছিল কি না জানিনা যে সমন্বয়ের কথা রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ বললেন তাতে প্রাচ্যপাশ্চাত্যের একটা মিলনের সূচনা পাই। রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই লিখেছিলেন "আজ মহাভারতবর্ষ গঠনের ভার আমাদের উপর। সমুদয় শ্রেষ্ঠ উপকরণ লইয়া আজ আমাদের এক মহাসম্পূর্ণতাকে গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। গণ্ডিবদ্ধ থাকিয়া ভারতের ইতিহাসকে যেন আমরা দরিদ্র করিয়া না তুলি। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অধুনাতন মনীষিগণ একথা বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে মিলাইয়া কার্য করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রামমোহন রায়, রাণাডে এবং বিবেকানন্দের নাম করিতে পারি। ইহাঁরা প্রত্যেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাধনাকে একীভূত করিতে চাহিয়াছেন, ইহাঁরা বুঝাইয়াছেন যে, জ্ঞান শুধু একদেশ বা জাতির মধ্যে আবদ্ধ নহে;

পৃথিবীর যে-দেশেই যে কেহ জ্ঞানকে মুক্ত করিয়াছেন, জড়ত্বের শৃঙ্খলা-মোচন করিয়া মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উন্মুখ করিয়া দিয়াছেন তিনিই আমাদের আপন।" বঙ্কিমও সাহিত্যের দিক থেকে একে পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এই মিলনের, এই Integration এর কথা সমাজ-জীবনের প্রতিফলন বলে মেনে নিলেও উগ্র স্বাদেশিকতার দরুণ এই জীবনবেদের বহিরঙ্গ রূপকে সেই যুগে খুব প্রশ্রয় দেননি। তাঁর স্ত্রীকে লেখা চিঠিগুলিই এই সময়কার তাঁর জীবনবেদকে পরিস্ফুট করে তোলে। এই সত্যসন্ধ মানুষটিই একদিন লিখেছিলেন—The atheist was in me, the sceptic was in me—সংশয়ীমন, অবিশ্বাসীমন, বিরোধীমন আমাকে তাড়া করে কিন্তু আমার মনে বিশ্বাস ছিল—এই যে বেদ বেদান্ত গীতা, এই যে অপরূপ যোগ—এর মধ্যে কোথাও একটা প্রকাণ্ড সত্য আছে, তাই আমি ভগবানকে বললুম—হে আমার পরমদেবতা, যদি তুমি থাকো, আমার মনের কথা জানতেও তোমার বাকী নেই—আমি ত নিজের জন্য কিছু চাইছিনা—ধন মান পুত্র পরিজন—যশ ঐশ্বর্য আমায় তুমি শক্তি দাও—এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করবার শক্তি—বিদ্যাবুদ্ধি—এদের আমি ভালোবাসি, এদের মধ্যেই কাজ করতে চাই।

প্রায় এই সময়েই দেখি তিনি স্ত্রীকে লিখছেন যে, দেখো আমার তিনটী পাগলামি আছে—প্রথম পাগলামি এই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান্ যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চ শিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন সবই ভগবানের...ভগবান্‌কে ফেরত দেওয়া উচিত···আমি যদি সবই নিজের জন্য সুখের জন্য বিলাসের জন্য খরচ করি তাহা হইলে আমি চোর···আমার ত্রিশকোটি ভাইবোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই দুঃখেকষ্টে জর্জরিত হইয়া কোন মতে বাঁচিয়া থাকে,...কি বল এই বিষয়ে আমার সহধর্মিনী

হবে'...দ্বিতীয় পাগলামিটা হচ্চে 'কোন মতে ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিতে হবে...হিন্দুধর্মে বলে নিজের শরীরে নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে'। সেই পথ অবলম্বন করে তিনি তখন উপলব্ধির তীরে পৌঁচেছেন। তাঁর তৃতীয় পাগলামির কথা বলতে গিয়ে তিনি বললেন যে, 'লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতকগুলো মাঠ, ক্ষেত্র বন পর্বত নদী বলে জানে—আমি স্বদেশকে মা বলে জানি, মার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে ? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়'।

তাই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁর নামকরণ করেছিলেন 'মানস-সরোবরের অরবিন্দ'।

॥ পনেরো ॥

অনেককেই অনুযোগ করতে দেখা যায় যে, কবি ও স্বাদেশিক শ্রীঅরবিন্দ যিনি রবীন্দ্রনাথের অনুপম ভাষায় শুধু বন্ধু নন, দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি, যিনি দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়, সত্যের গৌরবদীপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায় আপনার পূর্ণ অধিকার চেয়েছিলেন, তিনি স্বদেশ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু কবিতা লেখেন নি—যেমন লিখেছেন হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ।

ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে নোয়াই মাথা
তোমাতেই বিশ্বময়ীর আঁচল পাতা

*　　　　*　　　　*

হে মাতঃ বঙ্গ

*　　　　*　　　　*

জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে

*　　　　*　　　　*

বঙ্গ আমার জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ

*　　　　*　　　　*

ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা

কিন্তু বঙ্কিমের উপর কবিতাতেই দেখি কবির চোখে চিত্রিত হচ্ছে—

"O plains, O hills, O rivers of sweet Bengal
O land of love and flowers, the spring bird call

হে আমার মধুর বাংলার শ্যামবনানী নদীগিরিকন্দর

ফুলের দেশ, প্রেমের দেশ, জাগ্রত বসন্তের বার্তাবহের দেশ

বঙ্কিম বিবেকানন্দ শ্রীঅরবিন্দ রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবান্ধব দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি মনীষী কবি-ঋষিদের মনে প্রায় একই সময়ে দেশাত্মবোধের সঙ্গে মিলিয়ে যে মাতৃ-কল্পনা অমোঘরূপে বেজে উঠেছিল তারই মন্ত্র ছিল 'বন্দেমাতরম'। এই মন্ত্রদাতা বঙ্কিম, কিন্তু অরবিন্দ এর সাধক—সাহিত্যসার্থক ঋষির মন্ত্রকে তিনি উজ্জীবিত করে তুলেছিলেন—

Mother, I bow to thee

Rich with hurrying streams
Bright with orchard gleams
Cool with winds of delight,
Dark fields waving, mother of might
Mother free.

বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, ত্বং হি দুর্গা

Thou art Durga, Lady and Queen
With her hands that strike
　　　　　　and her swords of sheen
Thou art Lakshmi, lotus-throned
And the Muse a hundred-toned

*　　　　*　　　　*

Mother, mother, mother mine—মা, মা !

শ্রীঅরবিন্দের অপূর্ব দুর্গাস্তোত্রে আমরা পড়ি "বীরমার্গ প্রদর্শিনি

এসো, আর বিসর্জন করিব না, আমাদের অখিল জীবনে অনবিচ্ছিন্ন দুর্গাপূজা, আমাদের সর্বকর্ম অবিরত পবিত্র প্রেমময় মাতৃসেবাব্রত হউক, এই প্রার্থনা মাতঃ উর, বঙ্গদেশে প্রকাশ হও—

কারণ এখানে

Every image made divine
In our temple is but thine

সবই যে মায়ের মন্দির—ভবানীর মন্দির। বঙ্কিম দিলেন পবিত্র মন্ত্র, বিবেকানন্দ দেখলেন কালীর রুদ্ররূপ, শ্রীঅরবিন্দ দেখলেন আলুলায়িত কুন্তলা, মেঘাঙ্গী বিগতাম্বরা নামছেন—

Dark as a thundering cloud, with streaming hair ...obscuring heaven and in her sovereign grasp... the sword, the flower.

রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতেও ভেসে উঠল—

ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ

শুধু বাংলা দেশ কেন, বাংলার বাইরের কবিরাও এই মাতৃমূর্তি গ্রহণ করেছেন কাব্যে—একজনের কথা মনে পড়ে, যিনি শ্রীসুব্রহ্মণ্যম্ ভারতী—বাংলার ভাবধারায় পুষ্ট মহাকালীর সাধক। স্বাধীনতা, দেশপ্রেম, নতুন ভাষা পেল, ভাষ্য পেল তাঁর কাব্যে। বঞ্চিত লাঞ্ছিত অস্পৃশ্য পতিত নীচ অন্ত্যজ, পঞ্চম নতুন সুহৃৎ পেলে, যিনি কম্বুকণ্ঠে ডাকলেন—

জাগৃহি, জননী জাগো
সন্তান মাগে আশীর্বাদ মাগো
* * *
তুমি বাক্ অপরূপবাদিনী
অরাতিদমনে কলুষনাশনে চলেছ ত্রিশূলধারিণী
তুমি পবিত্রা, অতি বিচিত্রা
জাগো জননী, মরমভরনী, মাতা সুচিত্রা

ভিক্টুথ্লাই, ভিক্টুথ্লাই, ভিক্টুথ্লাই
স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা (লেখকের অনুবাদ)

আর একজন মহাকবি গাইলেন—(কবি ভল্লথোল)

ভবানী...এই আমার খড়্গ, খড়্গ তো নয় সে যে
কত যুগের কত হোমের শিখা,
এই যে আমার জন্মভূমি, এই যে আমার বুকে
ভারতবর্ষ—রাজর্ষিদের প্রোষিতভর্তৃকা

(অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের অনুবাদ)

শ্রীঅরবিন্দের কাব্যজিজ্ঞাসার দ্বিতীয় যুগে বিদুলা, বাজীপ্রভু প্রভৃতি কবিতাগুলি স্বদেশপ্রীতি ও সংগ্রামনিষ্ঠার আলোকে ঝলমল। ১৯০৭ সালে বন্দেমাতরমে 'বিদুলা' প্রকাশিত হয়, মহাভারতের উদ্যোগ পর্বের কিছুটা কাহিনী অবলম্বন করে প্রথমে এর নাম ছিল—"The Mother to her Son." বাজীপ্রভু ১৯১০ সালে কর্মযোগিনে প্রকাশিত হয়।

দেশপ্রেমের ছন্দে মহাভারতের একটি অল্পখ্যাত কাহিনীকে কাব্যে গ্রথিত করেছেন শ্রীঅরবিন্দ। প্রথমে এ কবিতাটির নামকরণ করেছিলেন—পুত্রের প্রতি মাতা—সিন্ধুর রাজ্যচ্যুত কুমার সঞ্জয় ও তার মা। মা পুত্রকে উৎসাহিত করছেন, উদ্দীপিত করছেন যুদ্ধ উদ্যমে—হৃতরাজ্য পুনরায় অধিকার করতে হবে। শত্রু বধ কর, বীর হও, দেশ মাতৃকাকে উদ্ধার কর—জীবন দাও, তবে মহাজীবনের আবির্ভাব হবে।

বাজীপ্রভুতে দেখি, মারাঠা শৌর্যের ও বীর্যের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে ফুটে উঠেছে অতীত গৌরববাহিনীর কাহিনী—ভবানী মন্দিরের প্রতিষ্ঠার কল্পনা। তখন বাংলাদেশে শিবাজী ও গণপতি উৎসব চলছে, স্বদেশী আন্দোলনের দিন। সেদিন রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব ভাষায় জয়তু শিবাজীর জয়গানে বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত—বিধির ভাণ্ডারে সঞ্চিত সে উদার ভাবনা একটি পুণ্যনামে সমুজ্জ্বল—

যে তপস্যা সত্য তারে কেহ বাধা দিবে না ত্রিদিবে—কিন্তু সেদিনের আর এক কবি শ্রীঅরবিন্দ শিবাজীর বদলে বাজীপ্রভুকেই তাঁর কাব্যের প্রধান নায়ক করে কবিতা লিখলেন—শিবাজীকে কেন্দ্র করে নয়। বাজীর মধ্যে তিনি মহাশক্তির আবির্ভাব দেখলেন—যে শক্তি মুঘল-পাঠান-রাজপুতকে হটিয়ে রেখেছিল। আমরা পড়ি—

We die indeed
But let us die with the high voiced assent
Of Heaven to our country's claim enforced
To freedom...

মরতে একদিন হবেই, আমরা মরবো, মৃত্যু আমাদের পণ, কিন্তু আমরা জানিয়ে যাব স্বাধীনতা বিধিদত্ত অধিকার, স্বর্গের অর্থাৎ ঊর্দ্ধের রাজ্যের পূর্ণ সমর্থন তাতে আছে।

শ্রীঅরবিন্দের বহু কবিতাই দীর্ঘ যেখানে drastic economy of words নেই। কিন্তু তারই মধ্যে কোথাও লিরিকের রস, কোথাও অন্য রস ফুটে উঠেছে অদ্ভুতভাবে, শুধু মণিময় মুকুতাধামে ডুব দিয়ে শুক্তি তুলতে হয় বলেই হয়তো ধৈর্য থাকে না। বাজীপ্রভু বা বিহুলা সেই ধরনের কাব্য—সমালোচকের ভাষায়—a scream of passion, radiant, full-throated and inspiring. বাজীপ্রভু heroic poems এর দলভুক্ত।

শিবাজীর রায়গড় যায় যায়। বাজীপ্রভুর উপর দুর্গ রক্ষার ভার দিয়ে তিনি পশ্চাৎপদ হলেন, নূতন সৈন্য সংগ্রহের আশায়। দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিলেন বাজীপ্রভু ও তাঁর বীর সৈন্যদল তানাজী মালসুরে প্রভৃতি। শেষ দৃশ্যে দেখি, আহত বাজীপ্রভু মৃত্যুতীর্থে যাবার জন্য অপেক্ষা করছেন, শিবাজী ফিরেছেন—গুরু রামদাসের মন্ত্রপূত গান গাওয়া হচ্ছে—দুর্ধর্ষ মুঘলরা পরাজিত ছিন্ন ভিন্ন। বাজীপ্রভু শান্তমনে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে অপর রাজ্যে

চলেছেন—দেহের শেষ রক্ত দিয়ে বীরের চরম তর্পণ। আকাশে ফুটে উঠছে দিন-শেষের চিতার আগুনে একটি স্বর্ণময় মুকুটের দ্যুতি।

এই হ'ল স্বদেশী কবি অরবিন্দের অনুপম কল্পনা—কারণ, দ্রষ্টা ও সাধক শ্রীঅরবিন্দ দেখেছেন বাসুদেবই সব—'তার শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করলো এবং আমি গীতার সাধনা অনুসরণ করতে সক্ষম হলাম। আমাকে শুধু বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয়নি, পরন্তু অনুভূতির উপলব্ধি দিয়ে জানতে হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছে কি চেয়েছিলেন। রাগদ্বেষ থেকে মুক্ত হতে হবে, ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে তাঁর জন্য কর্ম করতে হবে, নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হবে—তুমি যন্ত্র, আমি যন্ত্রী, আমি বললাম—দাও আমাকে তোমার আদেশ—তোমার জাতিকে সর্বদা এই বাণীই শোনাব যে সনাতন ধর্মের জন্যই তারা উঠছে,...ক্ষাত্রতেজই একমাত্র তেজ নয়...ব্রহ্মতেজ আছে—এই হলো নব বিশ্বামিত্রের নব অভীপ্সা। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন—"লেলে আমাকে যখন দীক্ষা দিলে তখন আমি এই সত্যটা জানতাম না যে জগতের মানুষকে উদ্ধার করতে হলে একজন মানুষের পক্ষে বিশ্বসমস্যার চরম সমাধানে পৌঁছনই যথেষ্ট নয়—তা সে মানুষ যতই অসামান্য হোক্ না কেন। বিশ্বমানবকে হতে হবে অমৃতের অধিকারী। শুধু উপরের আলো নামতে রাজী হলেই হবে না—সে নামেও (অন্য সাধকরাও সেখানে উঠেছেন এবং শক্তিকে নামিয়েছেন) কিন্তু তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যাবে না, যদি না নীচের আধার, গ্রহীতার আধার তাকে ধারণ করতে পারে...আমি চাই উর্ধ্বতর লোকের এমন কোন আলো এ জগতে আনতে, এমন শক্তি এখানে সক্রিয় করতে—যার ফলে মানব প্রকৃতির মধ্যে হবে খুব একটা বড় রকমের অদলবদল, ওলোটপালট—এমন কোনো দিব্যশক্তি যা এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে সক্রিয় হয়নি"। তাই দরকার আমূল রূপান্তর—অরবিন্দসাধনার বৈশিষ্ট্য এইখানে।

॥ ষোল ॥

ভারতীয় কাব্য-সাধনার ইতিহাসে সামাজিক সমষ্টিজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে মানবসত্তার ক্রমোন্নয়নকে কাব্যে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন শ্রীঅরবিন্দ—একটি নীতির স্তর, একটি বুদ্ধির স্তর, একটি ঐহিক ঐশ্বর্যের স্তর। বাল্মিকী, ব্যাস ও কালিদাস—এই ত্রয়ীকে অল্পবিস্তর এই তিনটি স্তরের প্রতীকরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই তিন স্তরের কাব্য পেরিয়ে চতুর্থ স্তরের কাব্যও আছে, যাকে আত্মার কাব্য (poetry of the soul) বলা যায়। এই উর্ধ্বতর অভীপ্সার কাব্য হিসাবে বেদ, উপনিষদের কিছু অংশ, শ্রীঅরবিন্দের নিজের সাবিত্রী, অশ্ব ঘোষের বুদ্ধচরিত, রবীন্দ্রনাথের নানাকাব্য, বৈষ্ণব কবিতা, মহাযোগী শঙ্করের কিছু কবিতা-স্তোত্রগুলিকে ফেলা যায়। কিন্তু চারিটি স্তরের বিভেদের কথা বললেও যুগে যুগে এই চাররঙা আকাশের রং-এর অদল বদলে মনের মাধুরী মিশিয়ে কল্পনার প্রলেপে কবিচারণদল মনের আনন্দে গান গেয়ে যাচ্ছেন, বীণায় ঝঙ্কার তুলছেন। সৃষ্টির প্রথম যুগ থেকেই কাব্যের উপজীব্য বিষয় হয়েছে যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রেম-ভালবাসা, মান-অভিমান, বিরহ-মিলন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি রসজ্ঞান আর সমস্ত আকাশ-বাতাস জুড়ে যে এক অদ্বিতীয় শক্তিকে কল্পনা করা হয়েছে, তাঁরই জয়গান, তাঁরই স্তবস্তুতি, তাঁরই কাছে আবেদন-নিবেদন, ভয়-ভক্তিতে মিশ্রিত, বিশ্বাস-অবিশ্বাসে দোলায়মান মনের আকুতি। আজকের যুগ শিল্পবিপ্লবের যুগ—ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে নানা বিশিষ্ট প্রশ্ন ও সমস্যা উঠেছে। আজকের কবির মনে তারই যে মূর্তি গড়ে ওঠে তাকেই তিনি ভাষার মাধ্যমে ভাবের রসায়নে রূপ দিচ্ছেন। নাদ বা ধ্বনির মধ্যেই আছে পরম প্রকাশের চেষ্টা—কাব্য হচ্ছে ধ্বনির

আলোক, Sign language, power of creating images. তাই শ্রীঅরবিন্দ বললেন, "Vision is the characteristic power of the poet, as is discriminative thought the essential gift of the philosopher and analytic observation the natural gift of the scientist". কবি করছেন দর্শন, দার্শনিক করছেন বিচার আর বিজ্ঞানী করছেন বিশ্লেষণ।

কবিদের দৃষ্টি একটা প্রতীককে ধরে কাব্যসৃষ্টি করে চলেছে এ দৃষ্টান্ত সুদুর্লভ নয়। কালিদাসের মেঘদূতই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আলঙ্কারিক ভামহ বললেন, কবির কি বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, অচেতন মেঘকে নিয়ে একি অযুক্তিমৎ ব্যবহার, উন্মত্তের মতো ভাবনা! কিন্তু সমালোচক দেখলেন না যে, কবির চিন্তায় আর আবেগে সব কিছুই চৈতন্যময়, ভাবময়, আবেগময়—সর্বং প্রাণং এজতি। ধূম-জ্যোতি-সলিল-মরুতকে নিয়ে যে মেঘ তাকেই তিনি প্রতীক করলেন। শেলীর স্কাইলার্ক, কীটসের নাইটিঙ্গেল, রবীন্দ্রনাথের হংসবলাকার মালিকা এরাও প্রতীক—বিরহ মিলনের অংশী, সুখ দুঃখের সাক্ষী। ওরা জড় নয় বটে কিন্তু কবির কল্পনায় ওদের যে প্রাণ, সে প্রাণ বিশ্বপ্রাণের স্পন্দনের সঙ্গে মিশে গেছে। প্রাচীন কাহিনীও অনেক সময়ে প্রতীক কাব্যের বাহন হয়ে থাকে। আর্থার-কাহিনী অবলম্বনে বহু কাব্য লিখিত হয়েছে যার মধ্যে অন্য অর্থ আছে। শ্রীঅরবিন্দের কাছে ঋগ্বেদ একটি রূপক কাব্য—প্রতীক সাহিত্য। তিনি তাঁর 'ভাগবত-জীবন' বা Life Divine আরম্ভই করলেন কুৎসআঙ্গিরস ও ঋষি বামদেবের উপাখ্যান নিয়ে, শাশ্বতীদের প্রথমা সেই উষাকে নিয়ে, অগ্নিরূপে ছড়িয়ে যে দেববীর্য তাকে নিয়ে। এই অগ্নিই আস্পৃহার প্রতীক—ঊর্ধ্বশিখ, সেই তো ফুটিয়ে তোলে দেবত্বের সব বিভূতি। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম অনুবাদের প্রথম সূত্রে গায়ত্রী ছন্দের ঋষি

বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা যে অগ্নিদেবতাকে পূজা করলেন তিনিই তো ক্রান্তপ্রজ্ঞা, ক্রান্তকর্মা, কবিক্রতু, বিচিত্র কীর্তিশালী (সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তম্), স্বয়ম্প্রকাশ, বর্ধমান, দক্ষিণে দক্ষিণাবান্। এই বৈদিক ঋতম্-কেই শ্রীঅরবিন্দ উদ্ধার করেছেন কাব্যে—সেই শুভস্পতী, বাজিনীবতী, দ্রবৎপাণিকে, সেই জগতো নিশেবনী রাত্রিকে। তাই বেদকে তিনি সায়ন বা যাস্কের অর্থে গ্রহণ করলেন না (ritualistic মতবাদ) বা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের naturalistic মতবাদও গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন – বেদ সেই যুগের লেখা যে-যুগে প্রজ্ঞাবাদী বুদ্ধিজীবী দর্শনগুলি গড়ে ওঠেনি, গড়ে ওঠেনি চুলচেরা তর্কবিচার সংশয়-বিশ্লেষণের মন। তখন মানুষের চেতনাই ছিল জাগ্রত, তীক্ষ্ণ শাণিত বুদ্ধি দ্বারা চিত্তবৃত্তি খণ্ডিত নয়—তখন সত্য আপনি উদ্ভাসিত হতো সাধকদের অন্তরে, তাই "Their aim was illumination not logical conviction, their ideal the inspired seer, not the accurate reasoner"—আত্মদীপ্তিই ছিল উদ্দেশ্য, তর্কবিচার নয়, অনুপ্রাণিত বোদ্ধাই ছিল ঋষিদ্রষ্টা, তিনি কূটতার্কিক ন'ন যে তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠাই হবে কাম্য।

কিন্তু বেদ ছাড়িয়ে যখন রামায়ণের যুগে আমরা এসে পড়লাম তখন সাহিত্যে রূপকের বিচিত্রতা আর নেই। সেখানে দেখলাম, একটা উন্নত সংস্করণের সভ্যতার চিত্র, একটা মৃদু মনোহর সংস্কৃতির পরিবেশ, একটা অনালোড়িত সমাজজীবনের ছবি যেখানে মানুষ আচার-বিচার বাহ্যানুষ্ঠানের চাপে শ্বাসরুদ্ধ হয় নি। এখানে আছে একটা আদর্শবাদের ঐতিহ্য। ব্যাস মহাভারতে কিন্তু যে-যুগের কথা গাইলেন সে-যুগে আমরা ক্ষত্রিয় নামে একটা অভিজাত সম্প্রদায়কে বিশেষ করে দেখতে পাচ্ছি, যখন শুধু সাম্রাজ্য ও আধিপত্য নিয়েই মারামারি কাটাকাটি হচ্ছে না, নিজেদের রীতিনীতি ধ্যান-ধারণা নিয়েও, সঙ্গে আছে অভিজাত্যের দম্ভ ও গৌরব 'noblesse

oblige'. রামের আদর্শবাদ সেখানে ক্ষুণ্ণ, পিতৃসত্যের জন্য বনবাসে না গেলে সমাজে হয়তো নিন্দনীয় হতে হতো কিন্তু একথাও সত্য যে, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ বা কেশাকর্ষণ ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণের সামনে প্রকাশ্য সভায় চলে, 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' স্বয়ং ধর্মরাজকে দিয়েও বলানো হয়। সেখানে দেখছি, নরনারীর সম্পর্কও কিছু শিথিল হয়েছে, সমাজ-বিন্যাসের ধারাও জটিল হয়েছে, মানসিক প্রবণতাও কুটিল হয়ে আসছে। তবু গীতার যোগে একটা সামঞ্জস্য বা synthesisএর চেষ্টা আছে, যদিও অনেকের মতে মূল মহাভারতে গীতার অংশটাই প্রক্ষিপ্ত।

তাই রাম-রাবণের যুদ্ধ আর কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ এক গোত্রের নয়। কবি বাল্মীকি আমাদের গল্প শোনালেন, নীতিগত সভ্যতার (noralised Civilisationএর), সেখানে শিল্পবোধ আছে কিন্তু শিল্পীর অহংজ্ঞান নেই, নাটকীয় রসবস্তু আছে কিন্তু নাটকীয় মিথ্যাভ্রান্তি নেই, মহাকাব্যের ছন্দ আছে কিন্তু মহাকাব্যীয় উপাদান অল্প। মহাভারতের কবি (বা কবির দল) কিন্তু সমাজে অভিজাতদের অতি কাছে বাস করছেন,—তাদের দ্বন্দ্ব, দ্বিধা, সীমা, সীমানা কবিচিত্তে নানা প্রশ্ন তুলছে। বাল্মীকি নিজেই রূপান্তরিত দস্যু, সমাজের নিম্ন-জীবনের সঙ্গে তাঁর এককালে পরিচয় ছিল, ক্রৌঞ্চমিথুনের জন্য মমতাই তাঁর কাব্যের উৎস। ব্যাস কিন্তু অভিজাত গোষ্ঠীর বাইরে নন, তিনি সেই গোষ্ঠীর রীতিনীতির গণ্ডিকে ছাড়িয়ে যেতে চান না। তাই শ্রীঅরবিন্দ বললেন, একজন হচ্ছেন নৈষ্ঠিক প্রাচীনপন্থী আদর্শবাদী, আর-একজনের দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে, তিনি বাস্তবতার পূজারী।

ব্যাস-বাল্মীকির বহু যুগ পরে এলেন কবি কালিদাস—চতুর্দিকে ঐশ্বর্যের সম্ভার, প্রাণের সমারোহ, সমাজজীবনের বৈচিত্র্য, নৃত্যগীত, অঙ্কন, শোভনিকা নিপুণিকা নারীর দল। সে যুগ জীবনকে মেনে নেওয়ার যুগ, দর্শন-ইতিহাস-পুরাণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করার (codification) বা সংকলনের যুগ। অনতিদূরের অতীতকে বর্তমানের

ভাষায় ছন্দায়িত করলেন কবি কালিদাস কিন্তু কালিদাসের অস্ত্র হচ্ছে সৌন্দর্যের অস্ত্র, উপমার শাণিত তরবার—তার মধ্যে পেলাম aesthetic beauty, sensuous emotion। তিনি তনুমাশ্রিত রসের রসিক, তিনি কৈলাসাচলের অতিথি হ'ন যেখানে ত্রিদশকামিনীরা, বিদ্যুৎবন্ত ললিত বণিতারা থাকেন, যেখানে মদনতাপ ব্যতীত কোন সন্তাপ নেই, যেখানে প্রণয়কলহ ব্যতীত কোন কলহ নেই, যেখানে যৌবন ব্যতীত কোন বয়স নেই।

নিসর্গ বর্ণনাতেও এই তিন কবির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে।

রামায়ণে একটি বিখ্যাত বর্ণনা আছে—

নিস্পন্দাস্তরবঃ সর্বে নিলীনা মৃগপক্ষিণঃ
নৈশেন তমসা ব্যাপ্তা দিশশ্চ রঘুনন্দন
শনৈ বিযুজ্যতে সন্ধ্যা নভোনেত্রৈরিবাবৃতম্
নক্ষত্র তারাগহনং জ্যোতির্ভিরিবভাস্যতে।

এখানে প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য সুষ্ঠু প্রযুক্ত—সব মিলে শুধু তামসী রাত্রির নয়, উদিত কাকজ্যোৎস্নারও একটা বিদগ্ধ রূপ কবি বাল্মীকি দিলেন। ব্যাস কিন্তু ভাষায় এতটা কোমলতা আনতে পারেন নি বা কালিদাসের মতো একটা 'effective architecture of style' ও গড়ে তুলতে পারেন নি, যেমন—

'তনুপ্রকাশেন বিচেয় তারকা প্রভাতকল্পা শশিনেব শর্বরী'

ব্যাসের কাব্যশিল্প গভীরতার দ্যোতক, বহিরঙ্গের ভাব-তরঙ্গে তাঁর কাব্যে রঙের প্রলেপ কমই, তাই প্রকৃতির বর্ণ-উন্মাদনা, তার লাস্যলীলা তাঁকে বিচলিত করে না, মোহাবিষ্ট করে না, কিন্তু মানুষের মনের গভীরতা তাঁকে স্পর্শ করে, যেমন যখন তিনি লেখেন—

বিললাপ সুদুঃখিতা
ভর্তৃশোকপরিতাঙ্গী শীলাতলমাশ্রিতা।

তখন এই শ্লোকার্ধেই একটি স্বামীপরিত্যক্তার (দময়ন্তীর বিয়োগ-

বিধুর ব্যথার) পরিচয় পাই। কিম্বা যখন বিরাট পর্বে কীচকবধের উদ্যোগে অপমানিতা দ্রৌপদী ভীমসেনকে বলছেন—

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কিং শেষে ভীমসেন যথা মৃতঃ

তখন কবির এই একটি শ্লোকের মধ্যে দ্রৌপদীর সমস্ত ব্যক্তিত্ব, তাঁর ক্রোধ, তাঁর সতীত্ববোধ, তাঁর আত্মাভিমান, তাঁর আভিজাত্য, তাঁর সংস্কারকে পুঞ্জীভূত দেখলাম। বাল্মীকির মধ্যে আছে মনের ক্রিয়া, ভাবের তরঙ্গ, সুনীতি-দুর্নীতি, ভালো-মন্দর বিচার, অর্থাৎ তিনি ইমোশনের কবি। ব্যাসের মধ্যে আছে ক্ষুরধার শাণিত বিচার ও বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা। তিনি শুধু হৃদয় দিয়েই গ্রহণ করছেন না, মস্তিষ্ক দিয়েও বিচার করছেন। তাঁর কাব্যিক রীতিও তাই কাব্যমীমাংসার সঙ্গে সায় দিয়ে যাচ্ছে।

॥ সতেরো ॥

মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে কবি বলছেন, বিদ্যা কার্যকরী হয় কর্মের দ্বারা—তৃষার্ত হলেই জল খেতে হয়—সবাই কাজ করে যাচ্ছে অতন্দ্রিত হয়ে—

অতন্দ্রিতো দহতে জাতবেদাঃ সমিধ্যমানঃ কর্মকুর্বন প্রজাভ্যঃ

সমিধমান অগ্নিও অতন্দ্র হয়ে দগ্ধ করে যাচ্ছে। এই সমিধমান্ অগ্নির উপাসকই ছিলেন—শ্রীঅরবিন্দ। অগ্নির মতো ঊর্ধ্বশিখ একমুখী ইই সাধনার অঙ্গ—

A thought was sown
A sense was born
A memory quivered.

কালের গহ্বরে, অন্ধকারের গভীরে, সীমাহীন শূন্যে প্রথমে

অভীপ্সার অগ্নি এসে লাগে একটি স্ফুলিঙ্গের মতো, তা থেকে জন্মায় একটি অপূর্বের অনুভূতি, সেই অনুভূতিই স্মৃতির কন্দরে স্পন্দিত হয়—কাব্য নেয় জন্ম।

অগ্নির সাধনাই আলোর সাধনা, আলোর সাধনাই অমৃতের সাধনা।

শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ সেই প্রাচীন কবিদের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথা মনে রাখা উচিত যে প্রত্যেক কবির মানসিক আবহাওয়া (mental climate) তাঁর নিজস্ব। প্রত্যেকেরই নিজের শিক্ষাদীক্ষা পরিবারপরিবেশ অনুভূতির তীব্রতা প্রকাশের ক্ষমতা অনুযায়ী একটি আলাদা পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে, একটি সম্পূর্ণ আলাদা 'মায়াবী মন' থাকে, যাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—It follows its own course and makes its own shaping experiments। রবীন্দ্রনাথের কথায়

গুণী বীণায় আলাপ করে প্রতিদিন।
একদিন যখন কেউ কোথাও নেই
এমন সময় সোনার তারে রূপোর তারে
হঠাৎ সুরে সুরে এমন একটা মিল হলো
যা আর কোন দিন হয়নি।

সেই শুভক্ষণ এলে কবিতাই হয়ে ওঠে মন্ত্র, অর্থাৎ অনুভূতির ঘনীভূত গাঢ় প্রকাশ, যা মননাৎ ত্রয়তে। তখন আর খেদ থাকে না।

মন্ত্ররচনার যুগে জন্ম হয়নি
মন্ত্রিত হয়ে উঠল না মন্ত্র
উদাত্তে অনুদাত্তে।

তখন আমির গহনে আলোআঁধারের সংগমে নতুন রূপ দেখা দেয়, নতুন রস জেগে ওঠে। যা ছিল প্রাণহীন প্রবাল তাই সাহিত্যের ভাষামহাদ্বীপ তৈয়ারী করে।

জীবনের সত্তর বৎসর পূর্তির পর (১১ই পৌষ ১৩৩৮) জয়ন্তী অভিনন্দনের 'প্রতিভাষণে' রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

"আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি 'মহৎকে', আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্মনিবেদন, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে, যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট। আমি আবাল্য অভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্যসাধনার গণ্ডীকে অতিক্রম করে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশে আমার কর্মের অর্ঘ, আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি—তাতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ। আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা—তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালণ করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।"

আশী বছর বয়সে 'জন্মদিনে' তিনি ঘোষণা করলেন —

"আজ আমার আশী বছরের আয়ুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নিজের জীবনের সত্যকে সমগ্রভাবে পরিচিত করে যেতে ইচ্ছা করেছি···আমি বার বার তপোবনের কথা বলেছি। সে তপোবন পেয়েছি কবির কাব্য থেকেই। তাই স্বভাবতই সে আদর্শকে আমি কাব্যরূপেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি। বলতে চেয়েছি 'পশ্য দেবস্য কাব্যং'—মানবরূপে দেবতার কাব্য দেখো। আবাল্যকাল উপনিষদ আবৃত্তি করতে করতে আমার মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে মানতে অভ্যাস করেছে। সেই পূর্ণতা বস্তুর নয়, সে আত্মার, তাই তাকে স্পষ্ট জানতে গেলে বস্তুগত আয়োজনকে লঘু করতে হয়"

যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই,
যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।

এই জ্যোতি-সমুদ্র-মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে
তারি মধু পান করেছি ধন্য আমি তাই।
যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই ॥
বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে
অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে।
প্রকাশ যাঁরে যায় না করা সকল দেহে দিলেন ধরা
এইখানেই শেষ করেন যদি শেষ করে দিন তাই
যাবার বেলা এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই ॥

॥ আঠারো ॥

প্রতি কবির কাব্য-রূপায়ণেই প্রেমের একটি বিশিষ্ট ও বলিষ্ঠ স্থান আছে সে কথা স্বীকার করতেই হবে।

সব যুগে সব দেশে সৃষ্টির আদিমতম দিন হতে নরনারীকে ঘিরেই তার প্রাণ-জিজ্ঞাসা, কাব্য জিজ্ঞাসার রূপে ঝঙ্কার দিয়েছে। আমাদের শাস্ত্রে বলে যে যিনি এক, যিনি অনাদি, যিনি অনন্ত, তিনি বসলেন তপস্যায়—যুগযুগ ধরে কালকে অতিক্রম করে, সীমাকে লঙ্ঘন করে রূপ ও অরূপের বিরাম সমুদ্রতটে—মহাকালের সে তপস্যা ; এই যে সর্বানুভূ—তাঁরও মনে একদিন ইচ্ছা জাগে আমি দুই হবো, খেলার সহচর চাই, লীলার সঙ্গিনী চাই। সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁর যে শক্তি কাজ করে যাচ্চে, নিঃশব্দে অলক্ষ্যে তাঁর যে কল্পনা রূপ নিচ্চে, ছন্দায়িত হচ্চে তারই সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি লীলায় বসবেন—যা ছিল অসীম তাকে মূর্তি দেবেন সীমায়—রূপ ও নামের বন্ধনে, যা ছিল মহৎ, বৃহৎ, ভূমা—তাকে তিনি একদিকে গুটিয়ে নেবেন অণুতে, আবার ছড়িয়ে দেবেন বিশ্বাতীতে। এই লীলাভিরাম এক থেকে হলো দুই, দুই থেকে হলো বহু। যা ছিল নিখিল বিশ্বের মাঝে অবিশেষ, অজাতভুবন ভ্রূণমাঝে লুপ্ত, সকল চেতনায় সুপ্ত, তাই বিশেষ হয়ে রূপ

নিলে মাতৃজঠরের অন্ধকারে, পিতৃবীর্যে সিক্ত হয়ে, কামনায় বহ্নিস্নাত হয়ে। ভূমিস্পর্শে সেই অণুর মধ্যে জেগে উঠলো বিশেষ দরদ, স্নেহ, প্রীতি-ভালবাসা। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছায় দাঁড়ায়। প্রেম কাকে বলে, তার সংজ্ঞা কি, সে শুধু দেহজ এণ্ডো-ক্রাইনের উচ্ছ্বাস, না imbalance, না ব্যক্তিস্বরূপের এক অভাবনীয় রহস্য, না শঙ্কর-বেদান্তের ভাষায় 'সত্যানৃতে মিথুনীকৃত' ভাব ও ভাবনার জোড়াতালি, না মানসিক বৈকল্য—সে বিচার মুলতুবী রেখে এই কথাই বলা যায় যে কাব্যের একটি প্রধান উপজীব্য বিষয়ই হচ্চে প্রেম। রক্তে যখন প্রথম কোটালের বান ডাকে, কবির হৃদয়ের প্রথম তারুণ্যের বিস্ময়ে আধোচেনার আলোয় ভালোবাসার মাধুরী কাঁচা-জীবনের পেলব রূপটি ধরিয়ে দেয়—তারপর প্রতিদিনের সংঘাতে সে আসন্ন প্রত্যাশার নিবিড়তার ঘোমটা ঘুচিয়ে শক্ত ধরণীকে দেখে—তার স্বপ্ন হয়তো ছুটে যায়—অতি সৌভাগ্যবান কয়েকজন কবির কাছেই দেহের সীমানা পার হয়ে প্রেম হয়ে ওঠে প্রণাম। একেই আমরা সাধারণতঃ নামকরণ করেছি Platonic Love—অর্থাৎ প্লেটোর eros তত্ত্ব যে প্রেমতীর্থের পরিক্রমার ছয়টি স্তরের কথা বলেছিলেন সেই বেদনাবিধুর আবেগ-মধুর স্তর পেরিয়ে যারা দেহ সৌন্দর্যকে স্বর্গীয় সৌন্দর্যের প্রতীকরূপে গণ্য করে লীন হয়ে প্রেমের দিব্য অনুভূতিতে পৌঁছেছেন। পরমসুধী শ্রদ্ধেয় বন্ধু অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয় সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের মানস-লক্ষ্মীকেও বেয়াত্রিচের প্রতি দান্তের যে প্রেম, লরার প্রতি পেত্রার্কের যে প্রেম, ক্রবাদুর প্রেম প্রভৃতির সহিত তুলনা করেছেন। প্লেটোর সিম্পোসিয়ামে অবশ্য এই অতিমানুষী প্রেমকে "union with the eternal and surpercosmic beauty" বলা হয়েছে। এই সৌন্দর্য-লক্ষ্মীই কীট্‌সে পেয়েছে সমবেদনা, শেলীতে উচ্ছ্বাস, বাইরনে কামুকতা, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থে প্রকৃতির প্রতি আনুগত্য, রবীন্দ্রনাথে স্পর্শ ও স্পর্শাতীতের মাঝের রূপ, অরবিন্দে রূপান্তর।

Platonic Loveএ আছে না-পাওয়ার বেদনা এবং সেই বেদনাকে মানসলোকে ভোগ করা। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের প্রেম-কল্পনা বেদনা-বোধের ঊর্ধ্বে রূপান্তরিত প্রেম, সহজ সাধনলব্ধ মুগ্ধের নিবেদন নয়।

তুমি যে তুমিই ওগো
সেই তব ঋণ
আমি মোর প্রেম দিয়ে
শুধি চিরদিন

এই ঋণ শোধের দাবী রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কল্পনা, মনের মাধুরী মিশায়ে তিনি প্রেমের কাব্য রচনা করে যাচ্ছেন, তাই বাস্তব জীবনে তাঁর প্রেমের কবিতা সংশয়ের দোলায় দুলছে—কখনো ঝুঁকছে অবাস্তবের দিকে—কখনো বাস্তবে। এর পরিপূর্ণ রূপ মহুয়ায়—রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কাব্যে রসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে উন্মাদনা—এই 'মায়া'কেই কবি নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছেন—যে প্রেম সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে নিজের ভিতরকার বর্ণে রসে রূপে।

রবীন্দ্রনাথ প্রেমের alchemyতে বিশ্বাসী, 'মূল্যহীনেরে সোনা করিবার পরশপাথর হাতে আছে তার'—এও রূপান্তর, কিন্তু এ রূপান্তর objectএর। শ্রীঅরবিন্দকাব্যে প্রেমের যে রূপান্তর সেটি object ও subject দুইএর মিলিত রূপান্তর। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রেমের যে পাওয়া সেটা emotionএর পাওয়া—স্থিতধী মানস-প্রতীকে পাওয়া নয়—অর্থাৎ বিশুদ্ধীকৃত ভাব (purified emotion) সেখানে অস্পষ্ট। দাড়িম্ববনের প্রচুর পরাগে, মাধবিকার সুরভি-সোহাগে, নবজীবনের বিপুল ব্যথায় শ্যামাসুন্দরী জাগছেন। প্রেমের এই উন্মীলনের মাঝে উন্মুখী মর্ত্যমন চঞ্চল থেকে অচঞ্চলের দিকে ছুটেছে—এর মধ্যে রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসি আছে, বিস্ময়ের জাগরণ আছে, স্তব্ধতার তপোভঙ্গ আছে, কিন্তু সব মিলিয়ে কাব্য-কুহেলিকার এক অস্পষ্টতা, পাওয়া না পাওয়ার এক বেদনা

বলিতে না পারে স্পষ্ট করি
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি

মাধবের জন্য মাধবীর দ্বিধা ঘুচছে না, আমরা দেখছি

এখানে অতিথি আসে ভয়ে ভয়ে
ছায়ারূপে
এসেছে কম্পিত মোর দ্বারে
কতো রাত্রে চৈত্রমাসে
প্রচ্ছন্ন পুষ্পের বাসে
স্পন্দিত করেছে জানি আমার গুণ্ঠনখানি
কাঁদায়েছে সেতারের তার

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন, অপরূপ কবি—নিখিলের অশ্রুতে হাসিতে যে নিঃশ্বাস তরঙ্গিত তাকে তিনি বাঁশীতে ধরেছেন—তাই তার মধ্যে নৃত্যছন্দ আছে, বিচিত্র-ভঙ্গি আছে, আলোছায়া আছে, জোয়ারভাঁটা আছে, পাওয়া না-পাওয়ার দোলা আছে—প্রেমের ব্রাহ্মীস্থিতিতে মিলন নেই। শ্রীঅরবিন্দের শেষের যুগের প্রজ্ঞামানসে প্রেমের যে প্রত্যয় উদ্ভাসিত সে প্রত্যয় স্থির—তিনি অসংশয়িত চিত্তে বলছেন—তুমি আছ, আমি আছি, সেখানে নিত্যরাস, অখণ্ড, অদ্বৈত অনুভূতি। তাঁর দৃষ্টি কবি ও সাধকের পিছনে পূর্ণযোগীর মিলিত দৃষ্টি। এখানে 'হয়তো' নেই, খণ্ড দৃষ্টি নেই—

বিস্মৃত প্রদোষে হয়তো দিবে সে জ্যোতি
হয়তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপনের মূরতি

তাই প্রণয়ের প্রসাধন কলা ও সাধনবেগের মধ্যে ভাবের আবেগ এসে বাসন্তিক স্পর্শে উপলব্ধিকে পার্থিব মৈত্রীসুধাময় করে তোলেনি, যা রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব। তিনি ভালোবাসার দুই প্রবাহেই স্নান করছেন। তাঁর কাছে নারী এসেছে

প্রিয়ার মধুর রূপে
এল সুর দিতে আমার গানে,
নাচ দিতে আমার ছন্দে,
সুধা দিতে আমার স্বপ্নে।
...   .
তুচ্ছতার আবরণে অনুজ্বল
অতি সাধারণ স্ত্রী-স্বরূপ

আবার

আমার ভালবাসার আর একটা ধারা
মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিতবাহিনী।
মহীয়সী নারী স্নান করে উঠেছে
তারি অতল থেকে।
সে এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে
আমার সর্বদেহে মনে,
পূর্ণতর করেছে আমাকে, আমার বাণীকে।
রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে
চির বিরহের প্রদীপশিখা।

রবীন্দ্রনাথ বিরহের বেদনাতেই মহাসমুদ্রের ইঙ্গিত দিচ্চেন। বিরহের পরে মিলনের যে মহাতীর্থ আছে তার কথা বলছেন না—

লীলা জলধি তীরে চলু ধাই
প্রেম তরঙ্গে অঙ্গ অবগাই

তাঁর কাছে

তপস্বিনী রজনীর তারার আলোয় তাঁর আলো। বিরহই তাঁর কাছে ভোগের বস্তু, বৃন্দাবন সেখানেই। প্রাপ্তির নিবিড়ত্ব মানস ভোগে।

রবীন্দ্রপ্রেম-কাব্যেও যে প্রেমের অশঙ্কিনী প্রতীতি নেই তা নয়—ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণভিক্ষা না যেচে তিনি নির্ভয়ের গান গাইছেন, পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে বাসররাত্রি-রচনার কল্পনা ত্যাগ করছেন—কিন্তু ভাষার অপূর্ব মাধুর্য, ভাবের চাকচিক্যময় সম্মোহের মধ্যে কল্পনাশ্রয়ী মন একটা অবাস্তব আধার (content) খুঁজে নিচ্চে—তাকে জীবন-দেবতা বলি, বা মানসলক্ষ্মী বলি, বা গ্যেটের ভাষায় The eternal feminine lead us on and upwards বলি, তাতে কিছু যায় আসে না। প্রথম যুগে যখন তিনি 'যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ', 'অচ্ছোদ সরসী-তীরে রমণী যেদিন"…এ সব কবিতা লিখলেন তখন তাঁর প্রেমকে দেহগত বলে তিরস্কৃত করা হোল, কিন্তু সে প্রেম বলিষ্ঠ প্রকৃতির অনুগত। কিন্তু পরের যুগে এই বলিষ্ঠতা মাধুর্যের মধ্যে হারিয়ে গেলো। শ্রীঅরবিন্দ প্রেমকাব্য ভাব ও ভাষার বাহন হিসাবে অতো কারুকার্যময় না হলেও তার বলিষ্ঠরূপ হারায়নি—যা বলতে চেয়েছে স্পষ্ট করেই বলেছে। স্থূল ও সূক্ষ্মের মধ্যে, দেহ ও দেহাতীতের মধ্যে যে রূপরেখা টানা হয়েছে সে ভেদ মূল্যায়নে ও রূপায়ণে, প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে নয়। তার মন্ত্র হচ্চে—সর্বং খলু ইদং—সব নিয়েই মানসের প্রকাশ - তার মূল্য প্রয়োগনৈপুণ্যে, কারণ পরিপূর্ণ জীবনই যোগ—আর যোগ কর্মের কৌশল। সত্তার আবরণ হিসাবে দেহ নিন্দনীয় নয়, লজ্জার ত নয়ই। দেহের কৃত কর্তব্যকর্মগুলিও নিন্দনীয় হতে পারে না—শুধু কর্মকে নিবেদন করে দিতে হয়, সত্তাকে রূপান্তরিত করে নিতে হয়—আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী। আমি দিব্যের আধার, এই বোধের জন্য সংযমের নিয়মের নিষ্ঠার প্রয়োজন—কিন্তু নারী নরকের দ্বার নয়, শ্রী ও হ্রীর প্রতীক্। নারী পুরুষের কাছে যা, নারীর কাছেও যে পুরুষ তাই—দুইএর মিলিত জীবনই যে প্রেমের পরিপূর্ণ মূর্তি, এখানে কামী ও কামিনী অবাস্তর। তপঃপ্রেত সাধনার দ্বারা, সংযমিত মনের দ্বারা, আত্মনিষ্ঠ বিশ্বাসের দ্বারা তুমি



শ্রীঅরবিন্দ

নিজেকে বদলে নাও—তুমি স্ত্রী হও, পুরুষ হও, তোমাদের মিলিত জীবনে প্রত্যেক কর্মে ভাগবত জীবনের ছন্দ প্রকাশিত হোক্, ব্যাপ্ত হোক। আর সেই মিলিত জীবনের রূপ কি হবে, তার প্রকাশ তোমার নিজের সত্য দৃষ্টিতে, নিজের বোধিদীপ্ত জীবনের অখণ্ড অনুভূতিতে। আমাদের দেশে বিবাহের মন্ত্রে আছে, তোমার জীবন আমার হোক, আমার জীবন তোমার হোক। সুধীজনেরা তাতে যোগ দিয়েছেন—উভয়ের মিলিত জীবন ভগবানের হোক্। শ্রীঅরবিন্দ-প্রেমতত্ত্ব এই সব-শেষের প্রশ্ন নিয়েই আরম্ভ করলে—উভয়ের মিলিত জীবন ভগবানের—তার পরে, আমার ও তোমার—এটা হচ্চে সোহং থেকে অহংএআসা—এবং সে-আমি বড়-আমি। অয়মহং ভোঃ যিনি তিনিই ভূতে ভূতে বিভক্ত—কাকে বলবো মায়া, স্বপ্ন, মরীচিকা, মিথ্যা, মতিভ্রম। মানুষের মন সব সময়েই অনঙ্গবাণ ব্রণ খিন্ন—শুধু মুখ ফেরালেই দেখা যায় যে যিনি মদনমোহিত তিনিই মদনমোহন, যিনি সবিশেষ তিনিই অবিশেষ।

পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে

শ্রীঅরবিন্দ-প্রেমকাব্য প্রথম যুগে গতানুগতিক ভাবে দেহগত হলেও ঠিক দেহাতীত কাব্য নয়, তথাকথিত Platonicও নয়। এ হচ্চে প্রেমের মুক্ত রূপ, দেহকে সর্বস্ব করে নয়, ছেড়ে দিয়েও নয়, রূপান্তরিত করে, যেখানে রক্ততরঙ্গের মত্ত কলরবে বাণী ভেসে যাবে না, আবার আসল জিনিসকে আড়াল করে আসলের বিকৃত স্বপন আকাঙ্ক্ষা মেটাবে না। ললিতগীতকলিত-কল্লোলে শিবশিবানী অর্দ্ধনারীশ্বররূপে দুর্বাসার রক্তচক্ষুকটাক্ষকে হেসে উড়িয়ে দেবেন। শ্রীঅরবিন্দের প্রেমের কবিতায় বৈষ্ণবকবির সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সখী কি পুছসি অনুভব মোয়
সেই' পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়

॥ উনিশ ॥

এই তিলে তিলে নূতন হওয়াই রূপান্তরিত প্রেমসাধনার তাৎপর্য। রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা যতদিন না সত্তাকে রূপান্তরিত করে ততদিনই বিরহ। তাই শ্রীঅরবিন্দ-কাব্যে প্রথম যুগে প্রেমের কবিতাকে কৈশোরের শ্যামল রসে বেগ আর আবেগের মধ্যে যে ভাবে দেখি, যে রূপান্তরের বীজ তার মধ্যে সুপ্ত দেখি, পরিণত বয়সে সাবিত্রীতে তারই পূর্ণ পরিণতি পাই।

কবি প্রিয়ার রূপটি কেমন্

Thy waist a crescent moon
Thy arms are walls for white caresses
Thy mouth a tale of crimson kisses
Thy eyes two amorous treasuries of fire
And in thy lips the ruby hue of Love

তোমার কটিতট বঙ্কিম চাঁদের মত
তোমার দুই বাহু শুভ্র আদরের জন্য
তোমার মধু অধর রক্তিম চুম্বনের গল্প বলে
তোমার দুই আঁখি যেন কামনার দুই অগ্নিগোলক
এবং তোমার ঐ ঠোঁট দুটি প্রেমের পদ্মরাগে রঞ্জিত

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখি

Love, a moment drop thy hand
Night within my soul expands
Coral kisses ravish not
When the soul is tinged with thought

কবি প্রেমের দেবতাকে ডেকে বলছেন—স্তব্ধ হও মীনকেতন, ক্ষণেকের জন্য

আমার আত্মার মধ্যে তামসী রাত্রি বেড়ে চলেছে—
তাইতো রক্তিম চুম্বনে কামনার লহরে আনন্দ জাগে না, আমার সত্তায় লেগেছে ধ্যানের রং। আবার কখনো বলছেন

I have tried to save my soul alive from your snare,
I will strive no more; let it flutter and perish there.

I too will snare your body alive, O my dove,
And teach you all the torture and sweetness of love.

কবি চেষ্টা করছেন তার আত্মাকে প্রেমের জাল থেকে বাঁচাতে—কিন্তু আর পারছেন না, বলছেন—শুধু তুমিই আমায় বাঁধবে না, আমিও বাঁধবো—এর নিবিড়তা, গভীরতা, সুখ-দুঃখ-ক্লান্তি তোমাকেও শেখাবো—

You shall grow white one moment, the next a rose.

তুমি বেদনায় সাদা হয়ে উঠবে আবার উল্লাসে হবে রক্তিম গোলাপ।

আবার কখনো দেখি তিনি কাতর হয়ে বলছেন, না—না আমায় কেউ ভালো বাসেনি

For there was none who loved me, no, not one.
Alas, what was there that a man should love.

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখি বেদনাবিধুর আত্মা কাঁদছে

O heart, my heart, a heavy pain is thine
What land is that where none doth know
Love's cruel name nor any word of sin
My heart, there let us go

হে আমার মন, কি বেদনার ভারেই না তুমি পীড়িত, কোথায় সেই দেশ যেখানে প্রেমের নিষ্ঠুর নাম কেউ জানে না, ভালোবাসাকে অন্যায় বলে মনে করে না। মন, চলো, সেইখানেই যাই—

With the wind and the weather beating round me
Up to the hill and the moorland I go

Who will come with me ? Who will climb with me
Wade through the brook and tramp through
the snow ?

ঝড়জলের সাথে যুদ্ধ করতে করতে আমি উঠছি পাহাড়ে, কে আসবে আমার সাথে, কে করবে আরোহণ ?

Not in the petty circle of cities
Cramped by your doors and your walls, I dwell
Over me God is blue in the welkin
Against me the wind and the storm rebel

আমি ঐ তোমাদের ছোট্ট গণ্ডীঘেরা শহরে থাকি না, আমার দুই পাশে ঝড় ও ঝঞ্ঝার প্রলয়, এ যেন কবির মনে রবীন্দ্রনাথের ভাষায়

জাগে মহা ব্যাকুলতা
মোর সর্বব্যাপী হিয়া
জলে স্থলে অরণ্যের পল্লব নিলয়ে
আকাশের নীলিমায়

কে চাও বাঁচবার মত বাঁচতে—who would live largely, who would live freely—এই অনন্ত আহ্বানে কে দিবে সাড়া—তাঁর প্রেমের কাব্যেরও এই আহ্বান—। তখনি

My soul arose at dawn

রাত্রিপ্রভাতে রবিচ্ছবি উদিত—আমার আত্মারও ঘুম ভেঙেছে, একটি solitary bird আমার কানের কাছে গুঞ্জন করলে, তার সুর কি—

A song not master of its note, a cry that preserved into eternity.

সে সুর অন্যলোকের সুর, সে কান্না অনন্তের কান্না। তাঁর কাছে জীবন মৃত্যু, মৃত্যু জীবন—

Life only is or death is life disguised
Life, a short death, until we are by life surprised.

এই মর্ত্যজীবন হচ্ছে ক্ষণিক মৃত্যু—কারণ বৃহত্তম জীবনের সে দ্বার, সেইজন্যই 'Man the lover'কে God the Goal'এর স্তরে উন্নীত করতে হবে। কিন্তু এইখানেই, এই দেহকে ছাড়িয়ে নয়, এই পৃথিবীকে বাদ দিয়ে নয়।

সাবিত্রীতে সেই কথাই তিনি বলছেন—দেহ মোর মুক্ত হবে আত্মার সমান—মৃত্যু আর তার অজ্ঞানকে অতিক্রম করে।

শেষে যখন সেই অতিক্রম হলো—যখন পরম দিব্য বললেন—All that thou art, shall to my hands belong. তুমি যাহা, সবই আমার—

I will pour delight from thee as from a jar
I will whirl thee as my chariot through the ways
I will use thee as my sword, as my lyre.

তুমি আমার অমিয়সুধার পাত্র, আমার তরবার, আমার বীণা। তুমি হবে a channel for my timeless force.

কাল-সীমায় অচিহ্নিত যে শক্তি তারই ধারক সত্যবান আর সাবিত্রী—তাই "a dual power of God in an ignorant world."—যিনি নিজেকে দুইএ ভাগ করেছিলেন তারই বিকাশ—এই যুক্ত প্রেমময় জীবনে—

You shall reveal to them the hidden eternities
The truth of infinitudes not yet revealed
Some rapture of the bliss that made the world
Some rush of the force of God's Omnipotence
Some beam of the Omniscient mystery.

তোমাদের সম্মিলিত জীবন জানাবে সেই পরম সত্য, সেই চরম ঋত, সেই অপূর্ব গান, সেই অচিন্ত্যনীয়ের সুর, কারণ

God be born into the human clay.

॥ কুড়ি ॥

স্বর্গকে জন্ম নিতে হবে বারে বারে মাটি-মায়ের কোলে—প্রেম হচ্ছে তারই দুয়ার। মহীস্বরূপেই অলঙ্ঘবীর্য। তাই যমের সঙ্গে তর্কের পর সাবিত্রীর যখন যোগধ্যান ভাঙলো, তখন তিনি এই পৃথিবীতেই ফিরে পেলেন সত্যবানকে—

She pressed the living body of Satyavan

এই যে অপূর্ব মিলন—দুহুঁ মিলি এক রসাভিসার—তাকে কবি চিত্রিত করেছেন এইখানে—

She bore thə blissful burden of his head
Between her breasts warm labour of delight
The waking gladness of her members felt
The weight of heaven in his limbs, a touch
Summing the whole felicity of things,
And all her life was conscious of his life.

তাঁর পীনোন্নত আনন্দচঞ্চল বুকের উপর প্রিয়তমের মাথার ভার এলিয়ে পড়েছে। তাঁর সত্তার সুখজাগরিত প্রতিটি অণু প্রতিটি অঙ্গ তরে মিলনোৎসুক—প্রিয়তমের অঙ্গে অঙ্গে স্বর্গের ভার—কেবল রসনিরমাণ—একের জীবনে আর-এক জীবনের যে অনুভূতি—এই মূল্যায়ন নিরূপণ—এই ত বিশুদ্ধ প্রেম, এখানে কামনার তাগিদ নেই, বাসনার রিরংসা নেই, লালসার ক্লেদ নেই। কিন্তু দেহ আছে।

সত্যবান উঠলেন জেগে, নবজীবনপ্রাপ্ত হয়ে—

When hast thou brought me Captive back,
Love chained to thee and Sun Light's wall,
O ! Golden beam and Casket of all
Sweetness, Savitri.

কোথা থেকে তুমি আমায় ফিরিয়ে নিয়ে এলে সাবিত্রী, প্রেমের শিকলে বেঁধে সূর্য করোজ্জ্বল ধরিত্রীতে—আমি কি ঘুমিয়েছিলাম—মনে হচ্চে দূরে বহুদূরে, অনন্তের পথে আমি চলেছিলাম—সেই মহাশূন্যের মাঝে তুমি পিছনে পিছনে চলেছো আমার।

সাবিত্রী বললে—Our parting was the dream. We are together. আমাদের বিচ্ছেদই স্বপ্ন—আমরা বিচ্ছিন্ন হতে পারি না—মৃত্যুর রাত্রিকে পিছনে ফেলে এসেছি আমরা—রূপান্তরিত হয়েছি।

তুজনে তুজনের দিকে চেয়ে রইলো, হাতে হাত, মুখে মুখ—এই আমি আর তুমি—

Hung on each other in a silent look

তারপর সত্যবান বললে—তুমি বদলেছো

সাবিত্রী বললে—হ্যাঁ বদলেছি বটে, কিন্তু সব ঠিক আছে—

All now is changed, Yet all is the same

প্রথম যৌবনে তিনি যে প্রেমের কবিতা লিখলেন তার মধ্যে ছিল Life's joy. warmth, sensuousness—কিন্তু তিনি একদিকে যেমন স্থূল দেহবিলাসী কবি নন, তেমনি দেহাতীত অতীন্দ্রিয় আরোপও নেই; কারণ তাঁর কাছে Even the body shall remember God এবং every feeling a celestial thrill—ব্যক্তিগত কামনা নেই, ইন্দ্রিয়গত লালসা নেই, আছে সেখানে সর্বানুভূর অনুভূতি। তাঁর বিখ্যাত Songs to Myrtilla কাব্যে Night by the sea এবং Estelle কবিতা তুটি প্রথম প্রণয়পরশমুগ্ধ কবি মনের উচ্ছ্বাস। কিন্তু সাবিত্রীতে

The earth I need, the heaven my thoughts desire
The world I inhabit and the God I adore.

সব কিছুই তুমি—আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে চিন্তায় বেদনায় তুমিই আমার পৃথিবী, আমার স্বর্গ, আমার দেবতা।

Thy body is my body's counterpart
Whose every limb my answering limb desire
Whose heart is the key to all my heart beats
This I am and thou to me.

প্রেমের এই সর্বময় রূপই কবি শ্রীঅরবিন্দের কল্পনায় ভেসেছে—দেহ বা দেহাতীত এ প্রশ্নই নেই—রূপান্তরিত সত্তা মাধুর্যে সিক্ত হয়ে চলেছে অনন্তের পথে—অগ্নিরথে তারা যাত্রী

Two powers from original ecstasy born
Pace near but parted in the life of man,
One leans to earth, the other yearns to the skies
Heaven in its rapture dreams of perfect Earth
Earth in its sorrow dreams of perfect Heaven.
Receive him into boundless Savitri
Lose thyself into Infinite Satyavan.

সেই এক অনাদি আনন্দের অনন্ত হিল্লোলে জেগে উঠলো দুই। একদিকে এই মাটির পৃথিবী, আর একদিকে অনন্তযৌবন আকাশ, এই দুই মিলিয়ে দুই নিয়েই দ্যাবাপৃথিবী আবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এই দ্বৈত, এই অর্ধনারীশ্বর। স্বর্গ ফিরে চায় ধরণীর দিকে,—যে ধরণী ক্লান্ত নয়, তপ্ত নয়, পূর্ণের পূর্ণাভিসিঞ্চনে মধুময়—আর পৃথিবী চেয়ে থাকে স্বর্গের দিকে—জরা-মৃত্যু-বিনষ্টির অতীত যে লোক। প্রেমের পট্টবাস পরে তপস্বী মানব চলবে স্বর্গের দিকে দীপশিখা হাতে—আর সেই আলো দেখে স্বর্গের দেবতা নামবেন মাটির পথে। কোন পাহাড়ের পারে কোন সাগরের ধারে কোন মানুষের বুকে দুয়ের হবে মিলন—তার অধীর প্রতীক্ষায় মানব মানবী দাঁড়িয়ে। শ্রীঅরবিন্দের কাব্য সেই প্রেম কিশলয়েরই বারতা, আর পরিচয় দিয়ে আসছে, যে প্রেম ফুলে-ফলে-পল্লবে ঊর্ধশিখ হয়ে উন্মোচিত সত্তার প্রতিটি অনুভূতিতে Inscribe the long romance of Thee and Me. তুমি আর আমি, তোমাকে আর আমাকে কেন্দ্র করেই বিশ্বরূপের পরিণতি।

॥ একুশ ॥

অরবিন্দ কাব্যের শেষ কথা, শেষ পরিণতি 'সাবিত্রীতে'—সব পথ এসে মিশে গেছে শেষে ঐ কাব্যমহাসাগরে। এই magnum opus-এ আমরা শুধু কাব্য, ছন্দ, ভাষার বিন্যাস, রূপায়ণের, চিত্র কল্পনার প্রাচুর্য, চিন্তার প্রখরতা, অসীম বিস্তার, ভাবের গাম্ভীর্যই পাই না, এখানে দর্শন, কাব্য, সাধনার ত্রিকাল ত্রিকায়ে এসে মিশেছে অনন্তের রাজ্যে, অনির্বানের পথে, অচিন্ত্যনীয়ের সুরে। মানুষের প্রেম, তার অনন্তজ্যোতির যাত্রাপথে যে নিত্য সাধনা, তার অনাদ্যন্ত অধ্যাত্মজীবন, তার যে অগ্নিময় ঊর্ধ্বগতি, যে সীমাহীন কাল Time space, Continuous-এর ঊর্ধ্বে প্রবাহিত, সেই মহাকালের কোলে মহাকালীর যে লীলা চলছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীঅরবিন্দের শ্রেষ্ঠ কাব্য 'সাবিত্রী'।

কাব্যের প্রচলিত ধারণা ও সংজ্ঞা দিয়ে বিচার করলে এর মধ্যে বেশ কিছু অসঙ্গতি দেখা অসম্ভব নয়। কেউ কেউ বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ এখানে "thinks too much, thought comes in...and profoundity keeps out poetry." কেউ বললেন যে, কাব্যের সাজ পরিয়ে 'perennial philosophy' পরিবেশন করলেন শ্রীঅরবিন্দ। সেইজন্য কাব্যহিসাবে সাবিত্রী ব্যর্থ না হলেও সার্থক নয়, স্পষ্ট নয়, বরং বিভ্রান্তিকর, কারণ এর রূপায়ণগুলি বা imageries কষ্ট-কল্পিত। কিন্তু যাঁরা এইরূপ মন্তব্য করে থাকেন তাঁরা শ্রীঅরবিন্দ কাব্যের যে বিরাট পরিধি সেটা ভুলে যান—এ হচ্ছে—Grand Saga of eternity—এখানে কবির দৃষ্টিতে—Sweep of the worlds'—the Surge of the ages—'অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডাণি সাবরনাণি জ্বলন্তি'। সেইজন্য বলা যেতে পারে "when it is

not understood, it is because the truths it expresses are unfamiliar to the ordinary mind or belong to untrodden domain or enter into a field of intuitive experience. It expresses a vision by identity, i.e., by entering into it." এর উপমা বা সত্য বোঝা সাধারণ মানুষের পক্ষে কষ্টকর, কারণ এ পথের কথা অজানা পথের কথা—একে সম্পূর্ণ বুঝতে গেলে সে রাজ্যে পৌঁছতে হয়—যে ছবি আঁকা হচ্ছে তার সঙ্গে একাত্ম হতে হয়।

শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী'কে মধুচ্ছন্দার মন্ত্রমালার ভাষায় বলা যেতে পারে

মহোঅর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা

ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি (ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডল তৃতীয় সূত্র ১২) বৃহতের মহাসাগর আপন রশ্মি দ্বারা যিনি রঞ্জিত করে তুলেছেন, সজ্ঞান করেছেন, উদ্ভাসিত করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের কাব্যজিজ্ঞাসার মূল সূত্রটিকে খুঁজতে গেলে এই আলোকোজ্জ্বল প্রজ্ঞা উদ্ভাসিত মানসের মধ্যেই তার অখণ্ড রূপটিকে পাওয়া যায়, যে অলোক আলোক শুধু মনের জগতেই ক্রিয়া করছেনা, বাইরের জগতেই প্রতিফলিত হচ্চে না, রূপান্তরিত করছে দৃষ্টিভঙ্গিকে, সমগ্র সত্তাকে, সমস্ত চিন্তার ধারাকে। 'সাবিত্রী' মহাকাব্যেই তার পূর্ণ পরিচয়। অনেকের মতে আজকের যুগে মহাকাব্যের দিন ফুরিয়েছে। এখন গতি আর প্রগতির যুগ, বিরামহীন, বিশ্রামহীন। সে দীর্ঘদিবস, দীর্ঘরজনী, দীর্ঘবরষমাস নেই—জীবনে এসেছে প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের দিন, জীবিকার জন্য হাহাকার। এখন কি আর রসিয়ে জরিয়ে শুয়ে বসে ভাবে ভাষায় মহাকাব্যের কল্পনাবিলাস চলে—সে সময়ত নেইই, মনও নেই, মননও নেই, আর নেই মনের সেই উত্তুঙ্গী আভিজাত্য। কথাটা হয়তো সত্য কিন্তু তবু দেখছি আজকের যুগেও বিরাট কাব্য

লেখা হচ্চেনা যে তা নয়। প্রায় 'সাবিত্রীর' সমধর্মী একটি কাব্য The Odyssey—A Modern sequel সম্প্রতি আমেরিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ২৪ খণ্ডে, ৩৩,৩৩৩ লাইন সুগম্ভীর কবিতায় গ্রীক্ কবি Nikos Kazantazakis এই অপূর্ব কাব্য লিখেছেন। হোমর যেখানে শেষ করেছেন সেইখানে এঁর আরম্ভ। তাঁর নায়ক সব ধ্বংস করে সুন্দরী হেলেনকে নিয়ে ইথাকা ছেড়ে চললো আফ্রিকায়, পৌঁছলো দক্ষিণ মেরুতে। মাটি, জল, আগুন, বাতাস, মন তাকে আচ্ছন্ন করলে, কিন্তু সে মুক্তি চাইলে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে—

Fire will surely come one day to cleanse Earth
Fire will surely come one day to make mind ash

অনেকেই বলে থাকেন আজকের যুগের লেখার ভঙ্গি, রচনাশৈলী, কাব্যের স্বরূপ, দীর্ঘের পরিধিতে রসোত্তীর্ণ হয় না। জানি না, এই রসোত্তীর্ণ কথাটা বলতে যত সহজ, বিচার-বুদ্ধির পরিমাপে তত সহজ ও সাবলীল কিনা। আমরা কথায় কথায়, সাহিত্যবিচারে বলে থাকি —এই লেখাটি রসোত্তীর্ণ হয়নি—অর্থাৎ এক কথায় আমার ভালো লাগেনি বা আমি বুঝিনি। কিন্তু এই ভালো লাগার মানদণ্ডটি কি— সেটা কি নির্ভর করেনা শিক্ষাদীক্ষা, সমাজ প্রভাব, পরিবেশ, কাল, চিন্তার ধারা, মানসিক প্রস্তুতি, বিচারবুদ্ধির সুষ্ঠু রূপের উপর। সেই জন্য আমার পিতামহের দিনে যে সাহিত্য রসসমৃদ্ধ মনে হতো আজকের দিনে তা হয়তো সেইরকম সাড়া জাগায় না। কিন্তু একথা ঠিক সাহিত্যে যখনি কোন জ্যোতিষ্ক দেখা দেন তখন তিনি নিজের একটা বিশেষ রূপ নিয়ে আসেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এটা হচ্ছে তাঁর নিজস্ব কৌলীন্য। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হয় কাব্য সাহিত্যের বিচার তার বিষয়বস্তুর গৌরবে বা মহান্ আদর্শে নয়, রূপকারের কৃতিত্বে, ধ্বনির আলোকে। আলঙ্কারিকরা বলবেন এই ধ্বনিই হচ্চে কাব্যের প্রাণ, রমণীদেহের লাবণ্যের মত। এই ধ্বনির যে কল্লোল তা শুধু স্থূল শ্রবণের গ্রাহ্যই

নয়, সূক্ষাতিসূক্ষ্ম রাজ্যেও প্রবেশ করে অধিকারী ভেদে। এই প্রসঙ্গে 'সাহিত্যের সার্থকতা কোথায়' শীর্ষক সাম্প্রতিক এক প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয় প্রবাসী সম্পাদক টি এস এলিয়টের 'On poetry and poets' সম্বন্ধে একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যা উল্লেখযোগ্য—It has been the rule that great poets should look for their own aesthetic principles and that they should become to this extent philosophers or borrowers of philosophy. এই নিজস্ব রসজ্ঞাননীতি ও তার প্রকাশ পাঁচজনের কাণে যদি বেসুরো বাজে, তাহলে ?

সাবিত্রীর ছন্দ, শ্রীঅরবিন্দের নিজের ভাষায় 'a blank verse without enjambment (except rarely)—each line a thing by itself and arranged in paragraphs of one, two, three, four, five lines (rarely a longer series) in an attempt to catch something of the Upanishadic and Kalidasian movement so far as that is a possibility in English.' অমিত্রাক্ষর ছন্দ বটে, কিন্তু এমন ভাবে তার বিন্যাস যে উপনিষদের ও কালিদাসের গাম্ভীর্য ও সাবলীলতা যেন থাকে, অবশ্য যতদূর ইংরাজীতে তা সম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বীকার করছেন এই ছন্দোবদ্ধতা বা Rhythm Structure বা ছন্দসংগঠন 'মডেল' হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী থেকেই এর একটি অনুপম উদাহরণ দিই। সাবিত্রীর Book Six, Canto one—The Word of Fateএ নারদ স্বর্গ হতে মর্ত্যে নামছেন।

In silent bounds bordering the mortal's plane
Crossing a wide expanse of brilliant peace
Narad the heavenly sage from Paradise
Came chanting through the large lustrous air.
Attracted by the golden Summer-earth
That lay beneath him like a glowing bowl

Tilted upon a table of the Gods,
Turning as if moved round by an unseen hand
To catch the warmth and blaze of a small Sun
He passed from the immortal's happy paths
To a world of toil and quest and grief and hope,
To these rooms of a See-Saw game of death
and life.

কবি সেই অবতরণের ছবি আঁকছেন। অম্বরে ধরায় আকাশে বাতাসে, কৈলাসে বৈকুণ্ঠে এই দেবর্ষির অবাধ গতি। বীণাহাতে হরিগুণগান করতে করতে তিনি লোক থেকে লোকান্তরে গমন করেন। এই রকম একটা ছবি কাব্যে, পুরাণে, নানা কথা ও কাহিনীতে আমরা পেয়েছি। লৌকিকতায় তাকে কোন্দলের গুরু বলেও আখ্যা দেওয়া হয়েছে কিন্তু মানসলোকে তিনি যে শুদ্ধ বুদ্ধ অপাপবিদ্ধ স্তরের একজন উচ্চাধিকারী সে-বিষয়েও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। নারদের অর্থ ই হচ্ছে নরের আশ্রয় যিনি, যে নর মুক্তিকামী, যে মানুষ তর্ক করে, যে মানুষ বুঝতে চায়, বোঝাতে চায়। কবির অনুপম কল্পনায় ফুটে উঠলো ঋষিপ্রবর নামছেন মর্ত্যের দিকে, মহাশূন্যের ভিতর দিয়ে, শতসহস্র সূর্য ঘুরছে, গড়ছে, ভাঙছে, অসীম সাগরের নর্তন চলছে। এই মর্ত্যসীমার পারেই (bordering the mortal plane) বিরাট শান্তির পারাবার (a wide expanse of brilliant peace)—উর্ধ্বে চতুর্দিক আলোয় উদ্ভাসিত—নিম্নে নিমীল এই পৃথিবী—একটা অদৃশ্য শক্তির হাতে ক্রীড়নকের মত ঘুরছে—একটা ছোট্ট সূর্যের উত্তপ্ততা নিয়ে, উপমা দিলেন কবি—Tilted upon a table of the Gods. কবি বলছেন তাঁর এই পৃথিবীতে নামা মানেই

He passed from Mind into material things
Amid the inventions of the Inconscient self

তিনি মানসস্তর থেকে জড়ের স্তরে এলেন যেখানে দুঃখ আছে, বেদনা

আছে, মৃত্যু আছে, জীবনের গোলকধাঁধা আছে, দ্বন্দ্ব আছে—কিন্তু এইখানেই আছে

The Secret Might of the Creative Fire

এই অগ্নির মধ্যেই আছে জাতবেদের প্রচ্ছন্ন শক্তি, সৃষ্টির গুহ্যতম রহস্য,—এই অগ্নি শুধু ত ধ্বংস করে না, কালোর রেখা রেখে যায় না, আলোতেও দীপ্যমান করে তোলে ঊর্ধ্বের অভীপ্সা, লেলিহান শিখায়। বৈদিক ঋষি জীবনযজ্ঞের এই প্রথম প্রতীককে বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তাকে আবাহন করেছিলেন, তাকে অগ্রণী করে এগিয়েছিলেন, পুরোহিত করেছিলেন। দেবর্ষি এই সংকোচশীল ও পরিবর্ধনশীল (contracting and expanding) পৃথিবীতে নামতে নামতেই অনুভব করেন জীবনের ও মৃত্যুর পরিধিকে,

He felt a sap of life, a sap of death

অনন্তের মহাশূন্য দিয়ে আসতে আসতে তিনি সৃষ্টিকর্তার কাজ দেখতে লাগলেন—কত পৃথিবী চন্দ্র সূর্য তারকা নীহারিকার দল গড়ছে ভাঙছে, সৃষ্টি লয়-বিলয় হচ্ছে প্রলয়ে—কত রূপ, কত রূপান্তর—

His eyes measured the spaces, gauged the depths
…He saw the eternal labour of the Gods.

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গানের সুর বদলে যেতে আরম্ভ করলো, তাঁর বীণার অনাহত ধ্বনি অন্য মূর্চ্ছনা ধরলে—তার মধ্যে এলো ভাবের রস, অনুকম্পার প্রেরণা—মাটির সঙ্গে যার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক—

He sang no more of light that never wanes

সেই চিরভাস্বরের গান আর কণ্ঠে আসছে না—

He sang no more of the deathless heart of love

প্রেমের যে অবিনশ্বর শাশ্বত রূপ তাও মনে পড়ছে না। এখনে অজ্ঞানের সুর (hymn of ignorance) ধরা দিচ্ছে। তাঁর গান অন্য মোড় নিচ্ছে, অন্য সুর ধরছে, অন্য তানে সাড়া দিচ্ছে—তার মধ্যে আমরা পাচ্ছি—the birth and joy and passion of the

mystic world, জন্ম নিচ্ছে এই অদ্ভুত প্রহেলিকাময় জগতে কাম-কামনা-দুঃখ-বেদনা-আনন্দ। রবীন্দ্র কাব্যে বারে বারে এই স্তরের সুর শুনেছি। শ্রীঅরবিন্দের কাব্যেও এর ছবি পাওয়া যায় না তা নয় কিন্তু কবি শ্রীঅরবিন্দ যোগী শ্রীঅরবিন্দ হয়ে আরো উর্দ্ধের কল্পনা করছেন এবং কাব্যে তাকে প্রতিফলিত করবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ভাষা, ছন্দ, কবির আবেগের কাছে হার মেনে যাচ্চে।

সাবিত্রী কাব্যের ছন্দের কথা পূর্বেই বলেছি। তার উপমাও অনেক সময়ে সাধারণের বাইরে—সেইজন্য হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে দুর্বোধ্য মনে হয়, যেমন তিনি বললেন—(সাবিত্রী দ্বিতীয় পর্ব, একাদশ সর্গ)

High architects of possibility
And engineers of impossible,
Mathematicians of the infinitudes
And theoricians of unknowable truths,
They formulate enigma's postulates
And join the unknown to the apparent worlds.

এখানে কবি, স্থপতিবিদ, ইঞ্জিনিয়ার, গণিতজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞদের নিয়ে কবিতায় জুড়েছিলেন—একে গুরুচণ্ডালী না বলি, সাধারণের মনে একটা কষ্ট-কল্পিত উপমাই মনে হবে, অথচ প্রয়োগনৈপুণ্যে এগুলো বেমালুম মিলিয়ে গেছে তাঁর কাব্যে। আবার দেখি তিনি উপমা দিচ্ছেন—

They clamped to syllogisms of finite thought
The free logic of an infinite consciousness,
Grammared the hidden rhythms of Nature's dance
Critiqued the plot of the drama of the worlds
Made figure and number a key to all that is
The psycho analysis of cosmic self

* * * *

The unkown pathology of the unique
Assessed was the system of the probable
The hazard of fleeing possibilities,

To account for the Actual's unaccountable Sum
Necessity's logarithmic tables drawn

* * * *

Derived the Calculus of Destiny

* * * *

Zigzagged at the gesture of a chess-player Will
Across the chequer-board of Cosmic Fate
Mathematised omnipotence, accountant mind.

এইরকম বহু উপমা 'সাবিত্রী' থেকে সংগ্রহ করা যায়, যা বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করতে বাধা নেই কিন্তু প্রথম ধাক্কায় যে কোন সমালোচক বলবেন যে কষ্টকল্পিত। এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে যে ভাবের কাছে ভাষা পরাজিত, তাই জানা-অজানা যত কিছু উপমা আছে ছন্দের কেন্দ্রের চারিপাশে গ্রথিত হচ্ছে—এখানে অঙ্কের সমাপ্তি হয়, কিন্তু নাট্যের অবসান নেই, কারণ এখানে যে নাটক লেখা হচ্ছে সেটা

Cast into a scheme the triple act of the One.

সেই One বা একই যে বহু, তার রূপ বহু, তার বিস্তার অনন্ত, তার গুণ অসীম, যোগেবিয়োগে তিনি অনাদ্যন্তবান,—তাই উপমা, ছন্দ, সব হার মানে। এখানে দোষ কাব্যের নয়, কবির—তিনি যে রাজ্যের কথা বলছেন, যার গান শোনাতে চাইছেন, যার বাণী ভাষায় ধরতে যাচ্ছেন তার পরিচয় শুধু আমাদের নেই তা নয়—তার উপযুক্ত ভাষাও নেই—তাই প্রতীক বা Symbol দিয়ে বোঝাতে হয়—এখানে তাই তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি—drastic economy of word and phrase নেই। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কবি লিখে চলেছেন শুধু মনের আনন্দে নয়, জীবনের 'মিশন' রূপেও। এই বিরাট কাব্যের সঙ্গে তাঁর জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—তিনি নিজে বদলেছেন, কাব্য বদলেছে। শ্রীঅরবিন্দআশ্রমে শ্রীমার আসবার পূর্বেই এই কাব্যের পত্তন—তখন ছিল প্রথমভাগে এই তপ্ত ধরিত্রীর

কথা—আর দ্বিতীয়ভাগে তার পরের কথা—Earth and Beyond. কবি বলছেন—The poem was originally written from a lower level—……In the new form it will be a sort of poetic philosophy of the Spirit and of Life much profounder in its substance and vaster in its scope than was intended in the original poem.

যদিও শ্রীঅরবিন্দ বললেন যে, প্রথমে এই কাব্য চেতনার নিম্নস্তর থেকে লেখা হয়েছিল তবুও সেটা সাধারণ পাঠকের পক্ষে যথেষ্ট উচ্চস্তর—তাছাড়া শ্রীঅরবিন্দ নিজেই স্বীকার করেছেন যে এই সব দার্শনিক কাব্যে 'much variation of tone' থাকতে বাধ্য—এবং এগুলির প্রয়োজন আছে কাব্যকে সামগ্রিক ও সমৃদ্ধ রূপ দিতে (for the richness and completeness of the treatment)।

॥ বাইশ ॥

রবীন্দ্রনাথ গাইলেন—

কোথায় আলো, কোথায় আলো, ভিতর বাহির কালোয় কালো—এই ত মানুষের কান্না, ভূমার জন্য, প্রেমের জন্য, আলোর জন্য কান্না। কিন্তু কাব্য শুধু জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস বা প্রকাশ নয়, flux of lifeই নয়, চঞ্চলা নদীর মত সৃজনশীল বিবর্তনও (creative evolution)। কবিতার মাধ্যমে কল্পনাশ্রয়ী মন শুধু বাইরের জগতকেই মনের লীলার সঙ্গে গ্রথিত করছে না, তাকে পদে পদে রূপায়িত করে, বৈচিত্র্যময় করে, সঞ্জীবিত উদ্দীপিত করে অর্থ ই বুঝিয়ে দিচ্ছে না—সে একটা গভীরতর অসন্তুষ্টির সুরও বহন করে নিয়ে চলেছে—হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনোখানে—এই অতৃপ্তির ধারা শুধু কামিনীর জন্য নয়, কাঞ্চনের জন্য নয়, ভোগের

বস্তুর অভাবের জন্য নয়, এ কান্না—আইনস্টাইনের ভাষায়—Inner Harmony বা আন্তর সৌষম্যের জন্য। রবীন্দ্রনাথ তাকেই বললেন ভূমার জন্য কান্না। মহাপ্রভুর কথায় বলা যেতে পারে

> ন বৈ যাচে রাজ্যং ন কনকমানিক্য বিভবং,
> ন যাচেঽরম্যাং সকলজন কাম্যাং বরবধূম্
> সদা কালে কালে প্রমথপতিনা গীতচরিতো
> জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে—

দেখা দাও, দেখা দাও, ধন নয়, মান নয়, কামিনী নয়, কাঞ্চন নয়। শ্রীঅরবিন্দ এর মূল রহস্যে গেলেন— কেন এই কান্না— because a subtler and vaster life is in birth— যে সূক্ষ্ম বিরাট জীবন জন্ম নিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে তারই প্রসববেদনা—হে মহাজীবন···লইনু শরণ লইনু শরণ। There are deeper and more significant things to be said than have yet been spoken--মনের মধ্যে অনেক কিছু না-বলা কথা জমা রয়েছে, তাকে প্রকাশ করতে হবে চিন্তার ধারায়, সমিষ্টগত সাধনায়। কাব্যই যে তার প্রকাশ— poetry, the highest essence of speech must find a fitting voice for them। কাব্যের এই স্তর শুধু কতকগুলি কথার সমষ্টি নয় বা ছন্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ নয়, বা রচনাশিল্পীর বৈচিত্র্যই নয়, ভাবে ভাষায় ঝংকারে ধ্বনিতে বর্ণবৈচিত্র্যে উপমায় গভীরতম রহস্যে তথ্য ও তত্ত্বের সমবায়ে একটি আন্তর অনুভূতির চিত্র। আপনার আমার কাছে হয়তো মনে হবে এ আবার কাব্য কী। কিন্তু চির-কালের মানুষের সাধনা আলোর সাধনা—তমসঃ পরস্তাৎ জ্যোতিষাং জ্যোতি। মহাযোগীর অনুভূতিতে সাবিত্রীর রূপকে অপূর্ব কল্পনাশ্রয়ী হয়ে ফুটে উঠলো যোগের মূল ছন্দ, কাব্যরসে সিঞ্চিত হয়ে। মৃত্যু হলো অমৃত, কালো হলো আলো, মহানিশাময়ী জেগে উঠলেন—

রসাতলমুখী জড় জগতের পর্বতদলে আলোড়ি দাও
অতলান্তিক গহ্বরতলে নবসৃষ্টির শিখা জ্বালাও
শিখা জ্বালাও
শিখা জ্বালাও
তারি অন্তিমে নব কল্পের তারা দীপালিকা দাও জ্বালি
মহাকালী
মহাকালী।

(কবি নিশিকান্ত)

শ্রীঅরবিন্দের ব্যাপক দৃষ্টিতে সাবিত্রীর প্রথম কথাতেই আমরা পেলাম—

It was the hour before the gods awake

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

ভোরের আগের যে প্রহরে স্তব্ধ অন্ধকারের পরে—

তন্ত্রে বলে রাতের শেষ প্রহরের আগেই কালীর রাত।

Then something in the inscrutable darkness stirred

সুপ্তির অন্তরাল হতে দূর সূর্যোদয়ের সঙ্গে একটা আলোড়ন জাগলো—A nameless movement—An unthought idea. মহানিস্তব্ধের প্রান্তে অনালোকিত অনন্তের মন্দিরে (unlit temple of eternity) নিবিড় আঁধারমাঝে যেন অরূপরাশি চমকাচ্ছে—অন্ধকারের মাঝে জাগলো The Symbol Dawn—আলোর প্রতীক, তার আলোড়ন—নির্বাক নামহীন অচিন্তনীয়ের মাঝে স্পন্দন—মহাসমাধিস্থ শিবের যোগনিদ্রাভঙ্গের পূর্বাভাস। সুপ্তির তিমিরবক্ষ ভেদ করে দীপ্তির কৃপাণহস্তে তেজস্বী, তাপস প্রতিদিনই আসেন, শুচিশুভ্র আত্মদৃপ্ত জাগৃতি প্রতিদিনই ঘটছে আমাদেরই vital planeএ, physical স্তরে, এরই রূপান্তর হবে না কেন মনোময় রাজ্যে। মহাভাস্বর

আসছেন অগ্নিরথে, তূর্য বাজছে আকাশপথে, চেতনায় লাগছে চিড়, কালোর অতল ভেদ করে—a long line of hesitating hue. কবির অপূর্ব উপমায় দ্বিধার ছন্দটি ধরা পড়লো—একটু রূপ, একটু রং, একটু রেখা, পতনোন্মুখ কালোর বহির্বাস গেল ছিঁড়ে, আলোর বন্যা ক্রমশঃ ছাপিয়ে গেল, ছড়িয়ে গেল, আকাশে বাতাসে দিকে দিগন্তরে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

নামহীন দীপ্তিহীন তৃপ্তিহীন আত্মবিস্মৃতির তমসার মাঝে
আলোকের বর্ণে বর্ণে নির্নিমেষে উদ্দীপ্ত নয়ান করিছে আহ্বান

একটা rapid series of transitions-এর মধ্যে কবির কল্পনায় অনুপম ভাষায় চিত্র অঙ্কিত হলো এই জ্যোতির্ময় উন্মেষের। শ্রীঅরবিন্দ শুধু বৈদিক কবিদের সার্থক উত্তরাধিকারী নন, সেই যজ্ঞহুতাগ্নিকে নবতম ও পূর্ণতম রূপ দিয়েছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও আমরা সেই জ্যোতির্ময়তার গান শুনি, যার মধ্যে—

অব্যক্ত বিরাট আশা ধ্যানে মগ্ন দিকে দিগন্তরে

* * * *

নির্মল নির্ভয়
কোন দিব্য অভ্যুদয়
কোন সে পরমা মুক্তি, কোন সেই আপনার
দীপ্যমান মহা আবিষ্কার

* * * *

জাগিবে হৃদয়
ভুবন তাহার হবে বাণীময় ;
মানস কমল একমনা
নবোদিত তপনেরে করিবে প্রথম অভ্যর্থনা।

এর ফলে কি হবে, নিরুদ্ধ চেতনা হবে চ্যুত, লালসা আবেশে জড়ীভূত স্বপ্নের শৃঙ্খলপাশমুক্ত হবে।

কবি শ্রীঅরবিন্দ, কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অনুভূতির স্তরের দিক থেকে কোন্ মানস চেতনা কাজ করছে সে বিষয়ে তর্কের অবকাশ থাকলেও দু' জনেই যে বৈদিক কবিদের সার্থক সাথী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আলোকের জয়ধ্বনি উঠিবে উচ্ছ্বসি
নাম কি উষসী।

॥ তেইশ ॥

রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিতেও সাবিত্রীর প্রতীক জেগেছে—কনকবরণীর কথা—আলোর প্রতীক হিসাবে—Symbol রূপে, কিন্তু ঠিক Legend রূপে জাগেনি অর্থাৎ ঐতিহ্যের যে ধারাবাহিকতা অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ তা নিয়ে, জাগেনি। তাই সেটা Saga of Eternity নয়, এতে শুধু প্রতিফলিত হয়েছে ভাস্বর মনের, এক জ্যোতির্ময় ছন্দ—

বহ্নি বীণা বক্ষে লয়ে দীপ্ত কেশে
উদ্‌বোধনী বাণী
সে পদ্মের কেন্দ্রমাঝে নিত্য রাজে
জানি তারে জানি।

সবিতার প্রথম স্পর্শে তিনি পাচ্ছেন জ্বালার তরঙ্গ, অগ্নির প্রবাহ, শান্তিহীন দাহ, উন্মাদ সংগীত, অজানা স্পন্দন, ব্যথায় বিস্ময় সবই vital planeএর প্রাণের লীলাখেলার দ্বন্দ্ব—তখনও তপস্যায় পূত হয়ে শোধিত হয়ে সাম্য রসবিধানে ধৌত নয়, তবু কবির দৃষ্টিতে আছে নবীর দৃষ্টি—তাই তিনি বলছেন—

তোমার হোমাগ্নি মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি
তারে নমোনমঃ

তমিস্র সুপ্তির কূলে যে বংশী বাজাও আদি কবি
ধ্বংস করি তমঃ।

তাই তেজের ভাণ্ডার থেকে তিনি প্রথমে ইন্দ্রজালের আয়ুধ সংগ্রহ করছেন—অপরূপ রূপের কল্পনা, হাসি কান্না, ভাবনা-বেদনা, ভুবন-অঙ্গনে আলিম্পনা, তরঙ্গহিল্লোল—প্রাণের বিচিত্র ভঙ্গি। কাব্য হিসাবে অপরূপ, কিন্তু মন্ত্র হিসাবে অসমাপ্ত। তবু তার বোধি চেতনায় দূরের আলোর দীপ্তি লেগেছে। তাই রবীন্দ্রনাথের 'সাবিত্রী' কল্পনায় কবিচিত্তের এক অপূর্ব আকাঙ্ক্ষা অনুপম ভাষায় মূর্তি নিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ মধুর কবি, বিধুর কবি, আমাদের অতি কাছের কবি—ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের মিলিত কবি।

তারা সব মিলে যাক্ অরণ্যের স্পন্দিত পল্লবে
শ্রাবণ বর্ষণে
যোগ দিক্ নির্ঝরের মঞ্জীর গুঞ্জন কলরবে
উপল ঘর্ষণে
ঝঞ্ঝার মদির মত্ত বৈশাখের তাণ্ডব লীলায়
বৈরাগী বসন্ত যবে আপনার বৈভব বিলায়
সঙ্গে যেন থাকে
তার পরে যেন তারা সর্বহারা দিগন্তে মিলায়
চিহ্ন নাহি রাখে।

কিন্তু কবি শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যয়ে কিছুই মিলায় না—তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ কবি, সাধকের স্থির বিশ্বাস সেখানে মিলেছে—মানসের অতি উর্ধ্ব ভূমিতে—সর্বং ইদং—

In the ending of time in the sinking
of space
What shall survive ?
Hearts once alive,
Beauty and charm of a face ?

Nay, these shall be safe in the breast
of the One
Nothing ends all but began.

মানবীয় বেদনায় মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে পারা যায়

আমারে তুমি অশেষ করেছ
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ জীবনে নব নব।

কিছুরই শেষ নেই সে বোধ আর আমারে তুমি অশেষ করছো এই বোধ মূলতঃ এক হলেও দৃষ্টিভঙ্গীতে বিভিন্ন। আমি ফুরিয়ে গেলাম, আবার নতুন হলাম, আর আমি মোটেই ফুরিয়ে গেলাম না, শুধু বদলে গেলাম—এই দুইয়ের মধ্যে যে প্রভেদ।

বলাকার ২২নং কবিতা সম্বন্ধে বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন —ধর্মবোধের প্রথম অবস্থায় শান্তং—মানুষ তখন আপন প্রকৃতির অধীন—তখন সে সুখকেই চায়, সম্পদকেই চায়, তখন শিশুর মতো কেবল তার রসভোগের তৃষ্ণা, তখন তার লক্ষ্য প্রেয়। তারপর মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের সঙ্গে তার দ্বিধা আসে; তখন সুখ এবং দুঃখ, ভালো এবং মন্দ এই বিরোধের সমাধান সে খোঁজে—তখন দুঃখকে সে এড়ায় না, মৃত্যুকে সে ডরায় না—সেই অবস্থায় শিবং তখন তার লক্ষ্য শ্রেয়। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়, শেষ হচ্ছে প্রেম, আনন্দ। সেখানে সুখ ও দুঃখের, ভোগ ও ত্যাগের, জীবন ও মৃত্যুর গঙ্গা-যমুনা সংগম। সেখানে অদ্বৈতং,—সেখানে কেবল যে বিচ্ছেদের ও বিরোধের সাগর পার হওয়া তা নয়—সেখানে তরী থেকে তীরে ওঠা। সেখানে যে আনন্দ সে তো দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিতে নয়, দুঃখের ঐকান্তিক চরিতার্থতায়। ধর্মবোধের এই যে যাত্রা, এর প্রথমে জীবন, তারপরে মৃত্যু, তারপরে অমৃত। মানুষ সেই অমৃতের অধিকার লাভ করেছে ·· সে সাবিত্রীর মতো যমের হাত থেকে আপন সত্যকে ফিরিয়ে এনেছে। সে স্বর্গ থেকে মর্ত্যলোকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তবেই অমৃতলোককে

আপনার করতে পেরেছে। মানুষের প্রার্থনা হচ্ছে—মৃত্যো র্মামমৃতং গময়। 'গময়' কথার মানে হচ্ছে পথ পেরিয়ে যেতে হবে, পথ এড়িয়ে যাবার জো নেই। এ কথা শ্রীঅরবিন্দেরও কিন্তু দুঃখের ঐকান্তিক চরিতার্থই তাঁর কাছে শেষ কথা নয়, সেই দুঃখকে আনন্দরূপে পরিবর্তিত করে পাওয়াও শেষ কথা নয়, তারও উর্দ্ধে মানসের যে স্তব্ধভূমি আছে তারই সন্ধানে যাওয়া শুধু নয়, সেই আলোককে নামিয়ে নীচের স্তরকে রূপান্তরিত করে নিত্য-সত্য স্থিতিতে পরিবর্তন করাও তাঁর লক্ষ্য।

সাধনার প্রথম স্তরে প্রাণদেবতার হাতে জয়টীকা আসে। সৃষ্টির প্রথম বাণীই হলো আলো, তার প্রত্যাশাই আকাশে দাঁড়িয়ে

রজনীর অঙ্গুলিতে অক্ষমালা ফিরিছে নীরবে
আলোক বন্দনা মন্ত্র জপে

* * *

সুন্দরের প্রাণমূর্তিখানি
মৃত্তিকার মর্ত্যপটে দিলে তুমি প্রথম বাখানি
সে হচ্ছে সূর্যের বহ্নিরূপ
ওগো সূর্যরশ্মিপায়ী
শত শত শতাব্দীর দিনধেনু দুহিয়া সদাই
যে তেজে ভরিলে মজ্জা মানবেরে তাই করি দান
করেছ জগৎজয়ী দিলে তারে পরম সম্মান।

সে অগ্নিচ্ছটায় প্রদীপ্ত হয়ে সবিতার কল্যাণেই মানুষ আজ দেবতার তেজে তেজীয়ান। রবীন্দ্রনাথের কাছে সে আকাশভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক, কল্যাণী, দেবতার দূত। দিব্যধাম থেকে নেমেছে এই আলোকের বর্তিকা (Descent)—কি এনেছে সে

মর্ত্যের গৃহের প্রান্তে বহিয়া এনেছে তব বাণী
স্বর্গের আকৃতি

শুধু আকৃতি নয়—মৃত্যুর আড়ালে যে অমৃতবারি আছে তাও, মৃত্যুর সঙ্গে বোঝাপড়া সাবিত্রীদেরই করতে হয়—

ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃত বারি
মৃত্যুর আড়ালে
দেবতার হয়ে হেথা তাহারি সন্ধানে তুমি নারী
দুবাহু বাড়ালে।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের কাছে—মাটির ভাণ্ডে শুধু অমৃতবারিই গুপ্ত নেই—মাটিই মূলে অমৃত—তাকে শুধু রূপান্তর করে নিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অমৃতের সে পরিচয়কে সম্পূর্ণ করতে চাননি—তিনি গতির কবি, স্থিতির নন—চলার পথের পথিক—সে-পথও অবশ্য ঊর্ধ্বের পথ, কিন্তু তাঁর নৈবেদ্য পূর্ণের কাছে অসম্পূর্ণ রাখছেন। তবে মানবীয় আবেদনের কাছে সে অভীপ্সা অপূর্ব—চাইতে চাইতেই যাব এই হলো তাঁর কামনা। চরৈবেতে তাঁর মন্ত্র—

আমরাও অন্তশ্চেতনার গভীরে, জ্ঞানে অজ্ঞানে সেই কথাই বলছি —অপাবৃণু।

॥ চব্বিশ ॥

খোলো খোলো হে আকাশ স্তব্ধ সব নীল যবনিকা
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দেরই হারানো কনিকা।

এই খোঁজবার কবিই রবীন্দ্রনাথ—এ যে আমাদের নিতান্ত মনের কথা—কবি আমাদেরই প্রতিনিধি হয়ে সেই কথা জানালেন মহাকালের দরবারে, বিরহ ব্যথার বাসরে। তাই রবীন্দ্রনাথ আমাদের এত প্রিয় কবি। আমরা তাঁকেই আমাদের আমমোক্তার নাম লিখে দিয়েছি। কবি শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু সেই আবেগদীপ্ত স্তর পেরিয়ে পৌঁছেছেন মহত্তমের ভূমিতে। সেই স্তরের কথা, আমরা বুঝি না, জানি না,

'কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।' বৈষ্ণব মহাজন যখন ভগবৎ প্রেমের কথা বলেন তা পৌঁছায় শেষ পর্যন্ত কান্তা-প্রেমে—প্রেমাচিদ্দীপ দীপনম্—সেখানে আছে শুধু এক জ্ঞানশূন্যা ভক্তির তন্ময়তা, নিবিড়ত্বে ভরপুর। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ যখন প্রেমের কথা বললেন তখন তার পূর্ণরূপ হলো এক চিন্তাহীন, ভাবনাহীন, উদ্বেগহীন, শান্তমের কল্পনা, যেটা শক্তিমুক্তিভুক্তির উপরে নিরুপাধিক নিরুপদ্রবের স্তব্ধভূমি, কিন্তু বৈশিষ্ট্য এইখানে যে তার মধ্যে আছে দ্বৈতের পরিপূর্ণ রূপ, জীবনের চিরন্তন হাঁ—Everlasting yes. মাটির কবি দুজনেই, আকাশের কবি দুজনেই—একজন চাওয়া-পাওয়া ঐশ্বর্য-মাধুর্যের লীলায় সত্তাকে খুঁজে পেলেন, আর-একজন তাকেই রূপান্তরিত করে শোধিত করে ঊর্ধ্বের সোনায় পরিণত করলেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে মাটি তখনও ইন্দ্রজালে ভরা, সেখানে বন্ধন আছে—সে বন্ধন দোলরজ্জু, সে বন্ধন শ্বেতপদ্ম, সে বন্ধন বীণাতন্ত্র, সুরে সুরে সেখানে ঝংকার বর্ষণ হয়। রবীন্দ্রনাথও হাঁ-এর কবি—চেতনার রঙে পান্না হচ্ছে সবুজ, তত্ত্বজ্ঞানীর 'না' হয়ে উঠছে 'হাঁ', কিন্তু সে হওয়া নিষ্কাম হয়ে হওয়া নয়, সকাম সালংকার, সোচ্চার। কানুর পীরিতি বৈষ্ণবের কাছে চন্দনের রীতির মত, রাধার কাছে শ্যাম যেমন চিকনধন্। জয়দেব যখন সাকাঙ্ক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষ, নাগরনারায়ণ, মুগ্ধমাধবের কথা বললেন—শ্রীঅরবিন্দ তখন কল্পনা করলেন সুপ্রীত পীতাম্বরকে, সানন্দ গোবিন্দকে, স্নিগ্ধ মধুসূদনকে, আর রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করলেন এক ঐশ্বর্যময়, ভাবময়, রূপময় প্রাণময়কে। 'যেন শ্যাম দেখা দিলো বনেরি কিনারে'। রবীন্দ্রনাথ পরম নির্বাক্ অসীম নক্ষত্রলোকের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছেন সেই প্রাচীন বৈদিক ঋষিদের কাছে প্রতিভাত জ্বলন্ত সত্যকে।

বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে আজ দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি
আকাশেতে সোনার আলোয় ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী।

ওরে মন, খুলে দে মন, যা আছে তোর খুলে দে
অন্তরে যা ডুবে আছে আলোকপানে তুলে দে।
আনন্দে সব বাধা ছুটে সবার সাথে ওঠ রে ফুটে
চোখের পরে আলস ভরে রাখিস নে তার আঁচল টানি।

শ্রদ্ধেয় শ্রীসুকুমার সেন রবীন্দ্ররচনায় বেদের প্রতিচ্ছবি হিসাবে ঋগ্বেদের এই শ্লোকটিকে স্মরণ করেছেন—

অধি পেশাংসি বপতে নৃতুরিব
অপোর্ণুতে বক্ষ উস্রেব বর্জহম।
জ্যোতি বিশ্বস্মৈ ভুবনায় কৃন্বতী
পাবো ন ব্রজং বি উষা আবরতমঃ॥

(১-৯২-৪)

রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে পড়ি, গায়ত্রী-সাবিত্রী মন্ত্র বাল্যকাল হতেই তাঁর মনকে কি ভাবে নাড়া দিয়েছিল।

দুইতটে ক্ষান্ত হলো পারাপার, ঘনালো রজনী,
বিহঙ্গের মৌন গান অরণ্যের শাখায় শাখায়
মহানিঃশব্দের পায়ে রচি দিল আত্মবলি তার
এক কৃষ্ণ অরূপতা নামে বিশ্ব বৈচিত্র্যের পরে
স্থলে জলে—

সাধকের অনুভূতিতে

ছায়া হয়ে বিন্দু হয়ে মিলে যায় দেহ
অন্তহীন তমিস্রায়। নক্ষত্রবেদির তলে আমি
একা স্তব্ধ দাঁড়াইয়া, উর্ধ্বে চেয়ে কহি জোড় হাতে
হে পূষণ, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার মাঝে এক্

আবার

আমি শান্ত দৃষ্টি মেলি নিভৃত প্রহরে,
পাঠায়েছি নিঃশব্দ বন্দনা
সেই সবিতারে যাঁর জ্যোতিরূপে প্রথম মানুষ
মর্ত্যের প্রাঙ্গণতলে দেবতার দেখেছে স্বরূপ
মনে মনে ভাবিয়াছি প্রাচীন যুগের
বৈদিক মন্ত্রের বাণী কণ্ঠে যদি থাকিত আমার
মিলিত আমার স্তব স্বচ্ছ এই আলোকে আলোকে
ভাষা নাই ভাষা নাই
চেয়ে দূর দিগন্তের পানে
মৌন মোর মেলিয়াছি পাণ্ডুনীল মধ্যাহ্ন আকাশে

আলোক তপস্বীর চেতনায় জাগে

আলোকের অন্তরে যে আনন্দের পরশন পাই
জানি আমি তার সাথে আমার আত্মার ভেদ নাই।
এক আদি জ্যোতি উৎস হতে
চৈতন্যের পুণ্য স্রোতে
আমার হয়েছে অভিষেক
ললাটে দিয়েছে জয়লেখ,
জানায়েছে অমৃতের আমি অধিকারী
পরম-আমির সাথে যুক্ত হতে পারি
বিচিত্র জগতে
প্রবেশ লভিতে পারি আনন্দের পথে

* * *

আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগরসংগমে

তখনি হেরি আমি আপন আত্মারে মৃত্যুর অতীত

॥ পঁচিশ ॥

আলোর সাধনা আর অমৃতের সাধনা এক হয়ে গেলো ঋষিকবিদের অনুভূতিতে। সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে চলেছে মৃত্যু তামসীর তাণ্ডবী লীলা। ছিন্নমস্তা বগলা হবেন অমলা কমলা। মৃত্যু মানেই খণ্ডতা, অপূর্ণতা। সেইজন্য প্রথম প্রশ্নই হচ্ছে, সেই মহান মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি দাঁড়াবে কে বজ্রের আলোতে। কে হবে মহা-মৃত্যুঞ্জয়ের উপাসক, যে শবকে ফিরিয়ে এনে শিবে পরিণত করবে।

ভাগ্যবিধাতার লিপিকে অগ্রাহ্য করে দুর্ভাগ্যের সামনে দাঁড়াতে পারে কোন শক্তিমতী ?

> Her soul arose confronting time and fate
> Immobile in herself, she gathered force

শক্তি তার কুলকুণ্ডলিনীর পূর্ণ চক্রে বসলো সেদিন, যেদিন বিধি-লিপির কঠোর বিধানকে বদলাতে হবে—That was the day when Satyaban must die—সত্যবানের মৃত্যু হবে—

প্রাণঃ প্রজানাম উদয়ত্যেষঃ স্যূর্য

মৃত্যুই অমৃততত্ত্বকে আনয়ন করে, মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

মৃত্যুই চলে, মৃত্যুই চালায়, সঞ্চরমান কালের ক্লান্তি দূর করে। মৃত্যু প্রাণেরই একটি ভঙ্গিমা। প্রাণের অন্নময় ভূমি থেকে যে বিদায় নিয়েছে তাকে যমের অর্থাৎ কালের নিয়মচক্র থেকে পুনরায় ফিরিয়ে এনে বিজ্ঞানময় আনন্দময় ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করবার যে সাধনা সেই হচ্ছে সাবিত্রীর তপস্যা। মৃত্যু, কামনা আর সংঘাত এই যে ত্রয়ী, এই হচ্ছে দিব্য প্রাণের ছদ্মবেশ—একে উন্মোচন করার প্রয়াসই সাবিত্রীর সাধনা। উন্মীলিত হবে কল্যাণতম রূপ—

Disown the legacy of your buried selves

অস্বীকার করো আত্মকেন্দ্রী গুহাশায়িত নিজেকে, বিকশিত হোক মাতৃশক্তি—

Mother now in her arose

এবং সেই শক্তিই

A living choice reversed fate's cold dead turn

বিধির নির্মম বিধান উল্টে দিতে ঐ এক শক্তি—অশ্বপতির যোগ এই শক্তিকে ধরায় নামিয়ে এনেছিল বিশ্বমানবের আর্তির জন্য।

সাবিত্রীর কাহিনী মহাভারতের। নিঃসন্তান অশ্বপতি সন্তান কামনায় তপস্যায় বসলেন। সবিতৃ হতেই সাবিত্রীর উৎপত্তি—সবিতা আলোর দেবতা—সু মানে প্রজনন, সৃষ্টি, তাই সবিতা জগতের প্রসবিতাও বটে। স্বর্গীয় সুধা 'সোমও' ঐ 'সু' হতে উদ্ভূত, আনন্দমের চিহ্ন। লোক লোকান্তরের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ অবচেতনা, বুদ্ধিচেতনা পেরিয়ে বোধিচেতনার সাগরে পাড়ি দিলেন অশ্বপতি অর্থাৎ জীবনের যিনি অধীশ্বর, একা অনন্তের পানে, অজ্ঞেয়ের মাঝ দিয়ে, হোমাগ্নিপুত সাধক। অপরূপ কবিতায় ফুটে উঠলো সেই অভিসার যাত্রার কাহিনী—

Alone he moved, watched by the infinity
Around him and the unknowable above

যোগী অশ্বপতির দৃষ্টিতে ধরা পড়লো

Here all Experience was a single plan
All came at once into his single view
He was one spirit with that Immensity
A seer within who knows the ordered plan

এখানে সম ব্রহ্ম, সর্ব ব্রহ্ম—যেথা যেথা নেত্র পড়ে—এই যে সামগ্রিক একমুখী দৃষ্টি এই তো সাধনার প্রথম অঙ্গ।

কিন্তু মহতী প্রাপ্তি এখনও হয়নি—তাই দৈববাণী হলো।

O soul, it is too early to rejoice
Thou hast reached the boundless silence of the self

*   *   *

Only the everlasting No has neared

তুমি এসেছো নেতিত্বের গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে, তোমার মনকে কেড়ে নিয়েছেন সেই তুঙ্গীনাথের নিশ্চলা সমাহিতির তীর্থ

But where is the lover's everlasting Yes

কোথায় সেই চিরপশ্যন্তী বাণী প্রেমিকের হাঁ, আমি আছি, অয়মহং ভো, তুমি আছ—সত্য আছে স্থির। অনুভূতির আর-এক স্তর থেকে দেখতে গেলে আর-এক কবির কথায়

চেতনার রঙে পান্না হবে সবুজ চুনি উঠবে রাঙা হয়ে
তত্ত্বজ্ঞানীর না, না, না ফুটে উঠবে হাঁ হয়ে রেখায় রঙে সুখে দুঃখে।

The bridge between the rapture and the calm
The passion and the beauty of the bride
The chamber where the glorious enemies kiss
The smile that saves the golden peak of things

একদিকে চঞ্চল জীবনের 'grand passion', আর একদিকে শান্তির পারাবার, নৈঃশব্দের তটভূমি—সেইখানেই বসে আছেন দীপ্ত অর্ধনারীশ্বর পূজার বেদীতে—কপালমালা পরিশোভিত, মন্দার-মালা পরিশোভিতা—নব জীবনের বিপুল ব্যথায় শ্যাম ও শ্যামা জেগেছে, শিব ও শিবানী দুলছে, যেন আর-এক মহাকবির ভাষায়

কুহেলি গেলো, আকাশে আলো দিল যে পরকাশি—
ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি

তারই পিছনে যে স্তব্ধ অচঞ্চল—The symboled Om. সত্যসন্ধ অশ্বপতি তখন আরো এগিয়ে চলেছেন—তিনি নামাবেন

সেই আলোককে—Into the texture of our bounded humanity. এই সীমিত দেহের প্রতিটি অণুতে।

আকাশবাণী উঠলো—না, না, মানুষ তুমি পারবে না, আমার অমেয় অবতরণ তুমি জাগিয়ো না—সে গুরুভার বহন করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। মানবের সে শক্তি যে আছে তারি সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে সেই অবতরণের প্রকাশ। তাঁর কাব্যে তারই কাহিনী। অশ্বপতি অনেক বাধা, মূক বিরাট বাধা, সরিয়ে লোকে লোকান্তরে পরিভ্রমণ করে সমস্ত কামনাকে টুকরো টুকরো করে বিশ্বজননীর চরণে ছড়িয়ে দিলেন। তাঁর সত্তার রূপান্তর হলো, অমৃতস্পর্শের অধিকারী হলেন তিনি।

His being spread to embrace the universal
United the within and the without

অন্তর ও বাহির ঐক্যে এক হ'ল—to make of life a cosmic harmony—জীবনের সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একতারায় একস্থরে বাঁধা হবে। তখন—

One shall descend and break the iron law

প্রেমের মহিমায় মৃত্যুর নিগড়কে যিনি ভাঙবেন তিনিই সাবিত্রী। নিঃসন্তান অশ্বপতি তখন দৈবীবলে বলীয়ান হয়ে তপস্যার বরে সাবিত্রীকে কন্যারূপে পেলেন। সেই কন্যা বড়ো হলো, যৌবনবতী হলো, পতিকামা হয়ে সে বনে গেলো এবং রাজ্যহীন বনবাসী দ্যুমৎসেন-পুত্র সত্যবানকে স্বেচ্ছায় বরণ করলে। এ পর্যন্ত মহাভারতের কাহিনীতে কোন বিশেষ গতিময়তার পরিচয় নেই। প্রাচীন কালের ঐতিহ্যে যে-কোন কামনার জন্য বিশ্বশক্তির কাছে তপস্যায় বসাটা কিছু নূতন নয়। এই সময়েই হোল নারদের আবির্ভাব। দেবর্ষি জানিয়ে দিলেন যে সত্যবান স্বল্পায়ু—বিশ্ব-বিধানের অমোঘ নিয়মে তার মৃত্যুদিন এক বছরের পরেই আসন্ন।

সাবিত্রী কিন্তু অচলা অটলা রইলেন—অগত্যা অশ্বপতিকে মত দিতে হলো। তারপরে এলো সেইদিন যেদিন সত্যবানের মৃত্যুর বিধিনির্ধারিত দিন। সাবিত্রী সত্যবানের সঙ্গেই গেলেন। নিয়মমত সত্যবানের মৃত্যুও হলো। তারপর যমরাজের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করে তাঁকে বিচারে পরাস্ত করে মৃতস্বামীর জীবন নিয়ে সাবিত্রী ফিরে এলেন এই সংসারে। যমরাজ তাঁকে নানা বরও দিলেন। মহাভারতের এই অপরূপ কাহিনীকে কেন্দ্র করেই ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো স্তব্ধের মানস সরোবরে শুধু হংসবলাকার দলই নয়, শব্দময়ী অপ্সরী রমণীরা নয়, স্পর্শ পড়লো সেই পাদপীঠে, প্রোজ্জ্বল জ্যোতির ললাটে ভূমাময়ীর তিলকচিহ্ন। শ্রীঅরবিন্দের কল্পনায় অশ্বপতি হলেন মানবাত্মার ঊর্ধ্বগতির, অভীপ্সার বাহক, সাধনার প্রতীক। এই অভীপ্সাই বেদে প্রজ্বলিত হোমাগ্নিশিখার দ্যোতক। মহাশক্তির অবতরণিকার প্রধান ভূমিকায় নামলেন সাবিত্রী, যিনি কনকোজ্জ্বল বরণী।

A world's desire compelled her mortal birth

অশ্বপতির যোগ মহাশক্তিকে নামিয়ে এনেছিল বিশ্বমানবের আর্তি-হরণের জন্য—

A playmate in the mighty mother's game

কে হবে সেই শক্তির লীলা সহচর—মহাসাধিকার সাধনার ধারার উপযুক্ত বীর্যবান বাহক ও আধার কে—না, যে নিজে সত্যবান অর্থাৎ সত্যে বিধৃত, সত্যে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তার পূর্বে তার নিজেরও রূপান্তরিত হওয়া প্রয়োজন, কারণ তার রক্তে রয়েছে খণ্ডের বীজ। যতক্ষণ না সাবিত্রীর শক্তি সেই মৃত্যুকে অতিক্রম করছে ততক্ষণ ঐ মৃত্যুর দ্বার ছাড়া রূপান্তরের সম্ভাবনা নেই—Death is a passage, মৃত্যুই চলে, মৃত্যুই চালায়। মৃত্যুতীর্থে স্নান করিয়ে রাত্রির গহিনে ডুবিয়ে তাই সত্তাকে পরিবর্তিত করে নিতে হবে এবং একমাত্র পরাশক্তিই সেই সাহায্য করতে পারেন। তাই সাবিত্রীর সঙ্গে

সত্যবানের মিলন cosmic necessity, সে মিলন যোগেরই ক্রিয়া বা ক্রিয়াযোগ। যে সত্তা এই বিশ্বের মাঝে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে ব্যষ্টির মধ্যে, সমষ্টির মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে, মানবমনের মধ্যে, বিশ্বের অণুতে রেণুতে, তিনি আবার নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন কোটিতে—এই নামাওঠা, যাওয়াআসার মধ্যেই মায়ের ছেলে মায়ের ঘরে ফেরে—তাই পরম ভাগবত যিনি তিনি শুধু সুদূরের দেবতা ন'ন—সেই ঊর্ধ্ব আনন্দের রাজ্যে, স্তব্ধের ভূমিতে আমিও উঠবো—Even the highest rapture time can give is a mimicry of ungratified beatitudes—কিন্তু যা পেলাম সে যতো ঊর্ধ্বের আনন্দেরই হোক না, যা পেলাম না তাঁর রসাভাসেরও যে শেষ নেই,—তাই তাঁকেও নামতে হবে, তিনি নামছেনও, আমার মনের নিভৃততম কোণেও, গভীর অন্ধকারেও তাঁর আসন পাতা। সেখানে যে বীণা বাঁধা হতেছে 'বাজবে যখন তোমার হবে তোমার সুরে সাধা'। সব ভাস্বর হয়ে উঠবে তাঁর স্পর্শে, বদলে যাবো আমি, যে আমি হচ্চি --Becoming—যে আমি অনন্তেরই প্রকাশ, অখণ্ড বোধেরই এক অনন্ত সীমাহীন সীমানা। শ্রীঅরবিন্দ কাব্য তারই কাব্যিক প্রকাশ। ভাষার মাধ্যমে প্রতীক।

॥ ছাব্বিশ ॥

'All language is symbolic—বললেন Lascelles Abercrombie. বেদে, বাইবেলে, পুরাণে, এই প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রীযুক্ত পুরাণী তাঁর 'Savitri—An Approach and A Study' পুস্তকে শ্রীযুক্ত H. W. Garrodএর এই মত উদ্ধৃত করেছেন "Once upon a time, the world was fresh, to speak was to be a poet, to name objects an inspiration; and metaphor dropped from the inventive mouths like some natural exudation of the vivified senses."—

একদা এই পৃথিবী যখন নবীন ও সতেজ ছিল, তখন কথা বলাই ছিল কবি হওয়া, নামকরণ করার মধ্যেই ছিল অনুপ্রেরণা এবং মানুষের উদ্ভাবনী মুখ থেকে যে সহজ উপমা বেরুতো তাই হতো তার উজ্জীবন্ত ইন্দ্রিয়ের সহজ প্রকাশ। তাই মানুষ বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করে বিচার করবার আগেই মন দিয়ে বুঝতো, গ্রহণ করতো।

শ্রীঅরবিন্দ ঋগ্বেদের সিম্বলিক ব্যাখ্যা করেছেন একথা পূর্বে বলেছি। ফ্রান্সিস টমসনের The Hound of Heaven আমাদের বেদের সরমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ইয়েটস্ ও AEর বহু কবিতাই কাব্যের মাধ্যমে এক রহস্যলোকের বার্তা আনে। ইয়েটসের মতে কাব্যের জগৎ হচ্ছে এক তন্দ্রাময় জগৎ, কাব্য তারই অনুলিপি (record of a state of trance), তাকে ঠিকমত ধ্বনি ও ব্যঞ্জনা দিয়ে রূপ দিতে হয়—। ভ্যালেরি, ব্যদলেয়র, মালার্মে, ভারলেন সিম্বলিক কবি বলে বিখ্যাত। জর্জ স্টিফান ও আলেকজাণ্ডার ব্লকও এই দলের। আদর্শ সৌন্দর্য ও আদর্শ প্রেম নিয়েই এঁরা ব্যস্ত। কিন্তু ইয়েটসের মধ্যে আমরা দেখেছি সেই দ্বন্দ্ব তাঁরই ভাষায় between self and soul.

কিন্তু এখানে অপর কোন অনুভূতি নেই, তাঁর অতীন্দ্রিয়তা আধ্যাত্মিকতায় পৌঁছয় নি। এই সব কবির কাব্যে আমরা পাই একটা "increased awareness" কিন্তু তারা পৃথিবীরই কবি, তার সুখ-দুঃখের কামকামনার। আরো আধুনিক কবি Day Lewis এর Magnetic Mountain-এর কথা পূর্বেই বলেছি। Stephen Spender-এর বহু কবিতাকেও Symbolic না বললেও অনুভূতিময় বলা চলে, যেমন A Trance—কবি ও কবিপ্রিয়া শুয়েছেন—একজন জেগে, একজন ঘুমিয়ে নিদ্রাতুরা প্রেয়সী শ্লথ আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে বিছানায় সরে গেছেন—প্রিয় চেয়ে আছেন ঘুমন্ত প্রিয়ার দিকে—সুষুপ্তির জগৎ থেকে যে সব ভাব আসছে তা প্রতিফলিত হচ্ছে তার মুখে চোখে—ঘুমন্ত সে কেঁদে উঠছে, ককিয়ে উঠছে—আশ্রয় চাইচে—কবির মনে দুঃখ যে প্রিয়তমার কষ্টের ভাগ তিনি নিতে পারছেন না।

I watch that precipice of fear
She treads among her naked distresses

তাই কবির সত্যানুভূতি হয়

To that deep we are committed
Beneath the forests of our flesh
And shuddering scenery of these dreams,
Where unmasked agony is permitted
And bones are bared of flesh that seems ;
Our hands unravelling beauty's mesh,
Meet our real selves ; our charms outwitted.

কবির কাব্যে আমরা নতুন জগতের সন্ধান পেলাম।—তাই হারবার্ট রিড়ের মত আজকের কবিও বলতে আরম্ভ করেছেন

Yesterday, tomorrow and today
Are in my single glance.

তাঁর 'Mutations of the Phoenix' পুরাণীর মতে "openly

symbolic. বিখ্যাত জার্মান্ কবি রেইনার মারিয়া রিল্কের কথাই ধরা যাক্—তাঁর Elegies ও Sonnets to Orpheusই সমধিক খ্যাত। কবির পরিচিতা এক বান্ধবীর কন্যার অকাল মৃত্যুকে অবলম্বন করেই কবির মনে যে গভীর সুর বেজে উঠলো তাকে symbolic বলাই চলে। এই মেয়েটি নাচতো চমৎকার, তার মধ্যে ছিল জীবনের প্রকাশকে রূপ দেবার একটা প্রচণ্ড চেষ্টা—সে অসুস্থ হলো—একদিন সে তার মাকে বললে যে সে নাচতে পারবে না—তার শরীর ভারী ও মেদবহুল হয়ে আসছে—কিন্তু তার জীবনীশক্তি ছিল অদ্ভুত—সে ধরলে গান—কণ্ঠে সুরও একদিন নিভে এলো—সে ধরলে আঁকা—মায়ের চিঠিতে কবি এই কাহিনী পড়ে এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে এই প্রতীককে ঘিরে তাঁর কাব্যলক্ষ্মী ঝংকার দিয়ে উঠলো, Sonnets to Orpheus'এ এবং এই প্রতীকের মধ্য দিয়েই কাব্যে প্রকাশ পেলো সাধারণ দৃষ্টির বাইরের কতকগুলি অনুভূতি, যাকে বলা হয়েছে সমালোচকের ভাষায়—This conception of existence as a wider orbit including both life and death necessitated (or implied) a reva uation of all experience, and particularly of love বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যটাই কবির কাছে বেড়ে গেলো—কবির অন্তর্দৃষ্টিতে প্রথম কবিতাতেই তিনি দেখলেন

A tree ascending there. O pure transcension
O Orpheus sings! O tall tree in the ear!
All noise suspended, yet in that suspension
What new beginning, beckoning, change, appear

বনস্পতি উর্ধ্বে উঠছে—অর্ফিউস—জীবন ও মৃত্যুরে যিনি সংযুক্ত করেন—তিনি গান ধরেছেন—সমস্ত শব্দ স্তব্ধ হয়ে আছে—তারই মধ্যে নূতনের আরম্ভ—নূতনের ডাক—নূতনের সুরে রূপান্তর। কবি শ্রীযুক্ত হারীণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত পাঞ্জাবের বিখ্যাত কবি ভাই বীর সিংহের 'বনস্পতি' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

কবি রিল্কে মৃত্যুকে রূপান্তর বলেই গ্রহণ করলেন না, রসান্তরও বটে।

Be, in this immeasurable night,
At your senses' crossways magic cunning,
Be the sense of their mysterious tryst
And should earthliness forget you quite,
Murmur to the quiet earth . I am running.
Tell the running water : I exist.

এই রূপান্তরিত অয়মহং ভোঃ-র গানই কবি গেয়েছেন। তাই তাঁর শেষ কবিতাগুলির একটিতে (Soul in Space) তিনি বললেন—

Here I am, here I am, wrested reeling.
Can I dare ? Can I plunge ?
But now,
Who'd be impressed if I said
I am the soul ?

* * *

Secret no more ;

কবি রিল্কের কাছে জীবনের সব কিছু অনুভূতিই রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন "for what he called 'transformation' as a fuel or charge for some tremendous rocket into unknown space." একটা গভীর আবেগ না এলে মানুষ তার চিহ্নিত সীমানা ছেড়ে যেতে পারে না—সেইজন্য তাঁর কাছে ত্যাগ বা ভোগ (Renunciation and fulfilment) দুই-ই এক্। হওয়াই (Being) হচ্ছে আসল। শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্র কাব্য ও সাধনারও মূলে এই কথা। সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যেই এই গণ্ডীর মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে নূতন রূপ নেবার যে প্রাকৃতিক রহস্য তাকেই বৈজ্ঞানিক আর দার্শনিক নাম দিলেন ক্রমাভিব্যক্তি বা এভলিউশন—এই যে বিস্তার, এই যে বিক্ষেপ, প্রকৃতির মধ্যে এই যে চিরন্তন আলোড়ন, একে খণ্ড খণ্ড করে

দেখাই আমাদের স্বভাব। জুলিয়ান হাক্সলী বলেন অভিব্যক্তির নানা রূপগুলি কালে স্থির হয়ে আসে (eventually reach their limits and becomes stabilised)। মানুষই একমাত্র জীব যে এই অভিব্যক্তির গণ্ডী ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তার প্রথম জয়লাভ যখন সে কথা কইতে পারলে, বলতে পারলে, জানাতে পারালে, এবং পরে লিখে রেখে যেতে পারলে তার চিন্তার ধারাগুলিকে। সেইখানে তার দ্বিতীয় জয়লাভ—ক্রো ম্যাগনন মানুষ যখন 'survival value' কিছু দিয়ে যেতে পারলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য। সে গুহাগুম্ফার গাত্রে আঁচড় কাটতে আরম্ভ করলে, সে তার কুঠারকে চিত্রবিচিত্র করতে শিখলে, সে আকাশের দিকে চেয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে প্রকৃতির সত্যকে জানতে চেষ্টা করলে। আজ তাই মনীষীদের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে "Is it possible that humanity is on the eve of yet another breakthrough on to a higher level, brought about this time by his own inner efforts and not by outer circumstances? মানবজাতির ও সভ্যতার আর-একটা গণ্ডি পার হবার সময় এসেছে না কি?

এর জবাব দিলেন Lowes Dickinson (A Modern Symposium)—"Man is in the making but henceforth he must make himself. To that point Nature has led him out of the primeval shine. She has given him limbs, she has given him a brain, she has given him the rudiments of a soul. Now it is for him to make or mar that splendid torso· Let him no more look to her for aid, for it is her will to create one who has the power to create himself." (Quoted by Kenneth Walker in his book on 'A study of Gurdjieff's Teaching)

এই উত্তর মনীষীর ও বৈজ্ঞানিকের—সাধকের নয়—কিন্তু সাধক

বলতে আমরা ত একটি বিশিষ্ট অদ্ভুত কল্পনাশ্রয়ী জীবকে ধারণা করি না—সাধক হচ্ছেন তিনি যিনি যে রকম ভাবেই হোক সত্যকে জানতে চেয়েছেন, ঋতকে বুঝতে চেয়েছেন—সে খণ্ড ভাবেই হোক্ অখণ্ড ভাবেই হোক্—বৈজ্ঞানিকও সাধক, কবিও তপস্বী, তাঁদের দৃষ্টিও সত্য-দৃষ্টি। যজুর্বেদে আছে—আমি উঠেছি ভূ থেকে ভুবে, তার পরে গেছি স্বর্গে, সেখান থেকে আমি যাব সবিতার জ্যোতির্ময় লোকে। শ্রীঅরবিন্দ বললেন—এই তো উধ্ব´গতি—আমার দেহ এই মাটির জড়ের উপাদান নিয়ে (Matter)—তাই থেকেই আমি উঠি প্রাণময় রাজ্যে (life), সেখান থেকে উঠি মনোময় রাজ্যে (Mind). এই মনোময় রাজ্যের শেষ কথাই হলো অতিমানস। এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি গল্প মনে পড়ে। গল্পটি উপনিষদের ভৃগু বারুণি সংবাদ। বরুণ ঋষির পুত্র ভৃগু বললেন—পিতা, আমায় ব্রহ্মবিদ্যা দান করুন, ব্রহ্ম অর্থে কোন হস্তপদবিশিষ্ট দেবতার কথা নয়, সর্বমৃগূঢ়মনুপ্রবিষ্টম্ যে রহস্য তারি অনুসন্ধান। ভৃগু বসলেন তপস্যায়—দিনের পর দিন যায়, রাত্রির পর রাত্রি—চোখের উপর ফুটে ওঠে—অন্নময়ী এই পৃথিবী, শস্যমালিনী এই বসুন্ধরা রূপরসগন্ধস্পর্শ নিয়ে শ্যামকান্তিময়ী—এতো মিথ্যা নয়, অন্নই ব্রহ্ম—অন্নেই সব বাঁচিয়ে রেখেছে—এই জড়ের দেহে প্রতিটি অণুতে রয়েছে সেই অন্নময় বীর্যের মহাশক্তি অবরুদ্ধ। সত্যের একটি পর্দা উঠে গেলো। জড়ের রহস্যের পিছনে আছে প্রাণের রহস্য—জড় ত প্রাণের কঞ্চুক। ভৃগু আবার বসলেন তপস্যায়—স তপোঽতপ্যত—প্রাণো ব্রহ্ম, যে প্রাণ এজতি, দুলছে, কাঁপছে, বিশ্বসত্তার সঙ্গে একাত্মীভূত যে প্রাণ, Elan Vital. আধুনিক বৈজ্ঞানিক দার্শনিক হয়তো এইখানেই থামবেন, দেখবেন সেই প্রাণের স্পন্দনকে, ছন্দকে, নিয়মকে। কবির ভাষায় বলা যায়—একদিকে 'আমার আমি আর একদিকে তোমার তুমি' এই মিলিয়েই চলেছে বিশ্বলীলা—একদিকে সেই মানুষী তনুমাশ্রিতম আমি আর একদিকে

ঘোররাবা মহাতামসী প্রকৃতি, এরই মধ্যে ভাঙছে, গড়ছে সৃষ্টির প্রবাহ, গড়ে উঠছে ঘটনার পুঞ্জ, আর থেকে যাচ্ছে নিত্য চক্রের আবর্তনে সৃষ্টিশীল বীজে অমর একটি সত্তা, আইনস্টাইনের কথায়—"the creative and imperishable individuality—the personality, inner harmony—" জগৎজীবনের ছন্দ। ভৃগু কিন্তু আবার তপস্যায় বসেছিলেন—প্রাণের পিছনে মনকে খুঁজেছিলেন, মনের পিছনে বিজ্ঞানকে—যে জ্ঞান বিরাট, বিপুল, বিশাল—তারপর পেয়েছিলেন আনন্দকে।

শ্রীঅরবিন্দের কাব্যের সম্যক্ বিচারে তাঁর পরিণতিবাদের মূল্য আছে। যে সত্তা নিজেকে এই বিশ্বের মাঝে ছাড়িয়ে দিয়েছে, ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টির মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে, বিশ্বের অণুতে রেণুতে, তিনিই আবার আজ নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন কোটীতে। Return of the spirit to itself. যোগ হচ্চে সেই পন্থা। তাই আকাশে বাতাসে ব্যষ্টির জীবনে, জাগরণে ধেয়ানে তন্দ্রায়, সমষ্টির লীলায় এই ক্রিয়া চলেছে—তাই যোগ মানে শুধু যুক্ত হওয়া নয়, মুক্ত হওয়াও, বিশ্বছন্দের মধ্যে আত্মসমর্পণ করে আত্মউন্মীলন করা—সমস্ত সত্তার একত্রীকরণ Integration। সাবিত্রীতে তারই প্রকাশ দেখি।

॥ সাতাশ ॥

কাব্যের অন্তর্নিহিত রহস্য প্রকাশ পেলো সাবিত্রী-সত্যবানের প্রেমের কাহিনীতে, যে প্রেম সব দ্বৈতের, খণ্ডতার সমন্বয়ভূমি, যে প্রেমের অপরাশক্তিই পরকীয়ায় ব্যাপ্ত হয়—সব জীর্ণ করে, নবজন্মের উপাদানে পরিবর্তিত করে, সত্তাকে রূপান্তরিত করে। এই শক্তির কাছেই হার মানে জাতবেদ অগ্নি, মাতরিশ্বা বায়ু অর্থাৎ যে শক্তি জড় চেতনায় বিকশিত, জৈব প্রেরণায় বিস্তৃত। এই শক্তি 'দেবাত্মশক্তি সগুণৈর্নিগূঢ়াং'—এর তুইরূপ ভোগ আর ত্যাগ, ঐশ্বর্য আর মাধুর্য। এই দার্শনিক সত্যের পরিপ্রেক্ষিতেই কবি শ্রীঅরবিন্দ 'সাবিত্রী'কে তিলে তিলে গড়ে তুললেন। উর্ধাশী মানবাত্মার প্রতীক্ যোগী অশ্বপতির তপস্যায় এই শক্তির অবতরণ হয়েছিল তাঁর ঘরে কন্যারূপে, গিরিরাজ তুহিতার মত। যৌবনবতী হলেন তিনি—ঘুরে বেড়ান নিঃসঙ্গ, একাকিনী। তাঁর ভালো লাগে বনজঙ্গল লতাপাতা, অরণ্যের বিহঙ্গম মৃগ। কবি দেখাতে চাইলেন সাধারণ মানুষের কাছে সাবিত্রী তুর্বোধ্য "too great was her demand, too pure her force". তাঁর দাবী, তাঁর শুচিশুভ্রতার কাছে সাধারণ মানুষ ম্লান হয়ে যেতো।

কিন্তু বিশ্ববিধাতার বিধানে মিলনের লগ্ন ঘনিয়ে আসছে।

যে তুর্লভ রাত্রি মম
বিকশিবে ইন্দ্রাণীর পারিজাত সম

But now the destined spot and hour were close

কবি শ্রীঅরবিন্দ গভীর নিভৃত স্তব্ধ অরণ্যের যে মহিমার মধ্যে সাবিত্রী ও সত্যবানের প্রথম শুভদৃষ্টির দৃশ্যকে উদ্ঘাটন করেছেন, পৃথিবীর যে-কোন সাহিত্যে তা প্রথমস্থান অধিকার করতে পারে। প্রকৃতির

বর্ণনায় যে রুচিরম্য শুচিস্নিগ্ধ গাম্ভীর্যের সঙ্গে কাব্য-সৌন্দর্যের প্রকাশ দেখি তা শুধু ভাবে ভাষায় অনবদ্য নয়, উপমায় ও ব্যঞ্জনায় মনোরমও। প্রথম রবিকরধৌত সেই তপস্যাপূত বনে 'প্রভাত যেন জ্যোতির্ময় দ্রষ্টা—morning like a lustrous seer' রূপে দেখা দেয় এবং অন্তহীন বনান্তের সেই গভীর নিঃস্বন যেন সেই অব্যক্তেরই ধ্বনি—titan murmur of the endless woods.

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে—তারা ধরণীর ধ্যান মন্ত্রের ধ্বনি, আলোকের প্রথম বন্দনা।

> সূর্যের যে জ্যোতির্মন্ত্র তপস্বীর নিত্য উচ্চারণ
> অন্তরের অন্ধকারে, পারিল না করিতে ধারণ
> সেই দীপ্ত রুদ্রবাণী,—তপস্যার সৃষ্টি শক্তিবলে
> সে-বাণী ধরিল শ্যামকায়া ; সবিতার সভাতলে
> করিল সাবিত্রী গান ; স্পন্দমান ছন্দের মর্মরে
> ধরিত্রীর সামগাথা—বিস্তারিল অনন্ত অম্বরে।

সেখানে বনে বনে মরকতদ্যুতিতে (dream of emerald woods) স্বপ্ন ঘনিয়ে উঠছে, ময়ূর ও পারাবত মনিমাণিক্যময় হয়ে খেলা করছে (peacock and parrot jewelled soil and tree), শ্বেত সারস স্তব্ধ অচঞ্চল রেখালীন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে (the white crane stood, a vivid motionless streak), আমরা শুনতে পাচ্ছি চক্রবাকের করুণ কান্না সমস্ত মায়াময় আকাশে বাতাসে (The dove's soft moon enriched the enamoured air).

এ যেন

> Earth couched alone with her great lover Heaven
> Uncovered to her consort's purple eye
> In her luxurious ecstasy of joy
> She squandered the love music of her notes,

Wasted the passionate pattern of her blooms
And festival riots of her scents and hues.

অভিসারিকা ধরিত্রী রূপে রসে গানে মোহময়ী হয়ে তার প্রিয়তম আকাশকে প্রেমবাসরে ডাকছে—সে নিজেকে দয়িতের কাছে লাস্যভারে উন্মুক্ত করে দিয়েছে, শুধু তাই নয় তার প্রেম কাকলীতে, গদগদভাষণে, গন্ধে বর্ণে সে অমিতব্যয়ী হয়ে উঠেছে। Squander, Waste, riot এই সব কথাগুলির প্রয়োগে কবি ধরণীর ঐশ্বর্যের আতিশয্যের দিকেও আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিচ্ছেন। এখানে তখনও পুরাণী শান্তি (primeval peace), যেন তখনও মানুষ আসেনি, যে মানুষ শুধু কৃত্রিমতার পূজারী।

The mighty mother lay outstretched at ease
All was in line with her first satisfied plan

এখানে তখনও জীবনের ছন্দ-পতন হয়নি, মহামায়া ঘোররাবা প্রকৃতি শুয়ে আছেন আনন্দে, সব কিছুই তাঁর প্রথম যোজনার সঙ্গে মেলানো—রবীন্দ্রনাথের কথায়—সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন।

এমনি দিনে, এমনি পরিবেশে, মহাপ্রকৃতির এই নিরঙ্কুশ অবস্থায় সাবিত্রীর সামনে এসে দাঁড়ালেন

A stranger on the sorrowful roads of Time
Immortal under the yoke of death and fate
A sacrificant of the bliss and pain of the spheres
Love in the wilderness met Savitri

মহাকালের যাত্রাপথে একাকী দাঁড়িয়ে সত্যবান—মৃত্যুর বিধানের জোয়াল ঘাড়ে করেও তিনি অমরাবতীর তীর্থযাত্রী। সারা বিশ্বের দুঃখের ও আনন্দের কাছে এই প্রেম ধরা দিয়েছে—অর্থাৎ মানুষী প্রেম হচ্ছে দুঃখ ও আনন্দের ঘনীভূত রূপ—এই দ্বৈতকে এক করে অদ্বৈতের

যে সাধনা, খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের যে অনুভূতি, তারি সার্থকতা সাবিত্রী সত্যবানের কাহিনীতে।

সেই বন্য প্রান্তরের পরিবেশে সাবিত্রী দেখলেন সত্যবানকে, সত্যবান দেখলেন সাবিত্রীকে—

Comrade and Sovereign eyes that claimed
her soul

তার চিরসাথী, তার সঙ্গী, তার আত্মাকে দাবী করছে যে সত্যবান—Erect and lofty like a spear of God—ভগবানের বর্শাফলকের মত সোজা ও ঋজু।

A mystic tumult from her depths arose

তাঁর অন্তস্তলের গভীর হতে কলস্বনা এক আকুতি, এক অভিব্যক্তি জেগে উঠলো—

The soul recognised the answering soul

আত্মা চিনে নিলে আত্মাকে

To live, to love are signs of infinite things
Love is a divine power by which all can change

বেঁচে থাকা মানেই ভালবাসা—ভালবাসা অনন্তেরই সন্ধান দেয়—যে দিব্যশক্তি রূপান্তর করতে পারে, সত্তাকে বদলে দিতে পারে।

An hour began, the matrix of new time, a new age, a new creation—সত্যিকার ভালবাসলেই জীবনের ধারা বদলে যায়—জীবনে নূতন সূর্যের হয় উদয়, নূতন যুগ আসে, নূতন সৃষ্টি, নূতন দৃষ্টি। সাবিত্রী কি রকম—

Near to Earth's wideness, ultimate with heaven.

মাটির পৃথিবীর সঙ্গে তার সম্পর্ক গভীর এবং স্বর্গের সঙ্গেও মিতালী ঘনিষ্ঠ। কবি উপমা দিচ্ছেন—

A priestess of immaculate ecstasies

জীবনযজ্ঞের প্রতিটি আনন্দোজ্জ্বল ছন্দে যিনি আহুতি দেন।

In her he met his own eternity
In her he found a vastness like his own

সত্যবান দেখলেন সাবিত্রীর মধ্যে তার নিজের মত এক উদার বিস্তৃতি—নিজের অনন্ত যেন সান্ত মূর্তি নিয়েছে তার মধ্যে।

She made her life his world for him to tread
and made her body room for his delight

সাবিত্রীর জীবন যেন সত্যবানের পৃথিবী, যার উপর দিয়ে তাঁর ত্রিধা পদ রেখে তিনি বিচক্রমণ করবেন। সাবিত্রীর তনু তাঁরই আনন্দের অনুভূতির ক্ষেত্র।

সত্যবান "gathered all Savitri into his clasp. লক্ষ্য করবার বিষয় যে কবি all Savitri বলছেন অর্থাৎ যে সাবিত্রী অখণ্ড—তার প্রতিটি সত্তা, প্রতিটি অনুভূতি, প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি কার্য, প্রতিটি সংস্কার, তার দেহ মন চিত্ত বাক সব নিয়ে যে সাবিত্রী—যেখানে দ্বৈত নেই, অজ্ঞান নেই, সবই সীমাহীনের মহানে বিলীন—a soul merging into God. Her separate life was lost in his.

ভালবাসার শেষ কথা এইখানে—তুমি নেই, আমি নেই, আবার তুমিও আছ আমিও আছি—দুই মিলিয়ে এক অখণ্ড অনুভূতি।

তুমি আর আমি মাঝে নাই কেহ
কোন বাধা নেই ভুবনে

সাবিত্রী ফিরলেন অশ্বপতির প্রাসাদে। নারদ ততক্ষণে এসে গেছেন। তাঁর গান চলেছে—সুরে আমরা পাচ্ছি

Yearning towards the eternal light

* * *

And Love that broods within the dim abyss
And waits the answer of the human heart
And death that climbs to immortality
Of the glory and marvel still to be born.

সেই পরম আলোর জন্য স্পৃহা, সেই পরিপূর্ণ প্রেমের জন্য, সমর্থা রতির জন্য, মৃত্যুহীন অমৃতের জন্য, মানুষের মন যার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকবে, যে জ্যোতি যে মহিমা আজও অজ্ঞাত।

অশ্বপতি নিজে রাজযোগের সাধক—তিনি জেনেছেন মহারাত্রির শক্তিকে, ভাগবতী লীলার গুহ্য পরিচয়কে—

The mystery of Gods' covenant with the night.

তিনি মহাশূন্যে লোকে লোকান্তরে, চিন্তার স্তরে স্তরে ঘুরেছেন, তিনি উত্থান পতনকে দেখেছেন, জেনেছেন জীব ও শিবের মধ্যে ভেদাভেদ নেই।

Then was no barrier between world and God.

সাধনার প্রথম স্তর—মর্ত্যসীমাকে ছাড়িয়ে অসীমের দিকে যাত্রা (transcending the human formula), দ্বিতীয় স্তরে ঊর্ধারোহণ, তৃতীয় স্তরে মহাশক্তির অবতরণ, চতুর্থ স্তরে সেই শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে সমস্ত সত্তাকে রূপান্তরিত করা।

সাবিত্রীই হচ্ছেন সেই অবতরণের প্রতীক

One shall descend and break the iron law

নিয়মের (অর্থাৎ যমের) নিগড় যে ভাঙবে।

Beauty shall walk celestial on the earth

স্বর্গের উদয়াচল থেকে মূর্তিমতী ঊষসী নেমে এই পৃথিবীতে বেড়াবেন। নারদের মুখ দিয়ে কবি শ্রীঅরবিন্দ নিত্য সত্যেরই আভাস দেন নি, অপূর্ব কাব্যও রচনা করেছেন।

মর্ত্যকায়ায় যিনি সাবিত্রীর মাতা তিনি সুন্দরী আবেগবতী প্রজ্ঞাম্বু-বেশাও বটে কিন্তু তিনি মানুষী— তিনি প্রশ্ন করেন কেন মানুষকে দুঃখ পেতে হয়, কেন বেদনার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, কেন তিক্ততার গহিনে ডুব দিতে হয়। নারদ তার উত্তর দিলেন—আনন্দের ঘনীভূত লুপ্ত

রূপই হচ্ছে বেদনা—তার একদিকে অজ্ঞানের আবরণ আর একদিকে অন্ধকারের চীৎকার—cry of darkness to the light.

নারদ গান ধরলেন

'ভালোবাসি ভালোবাসি'
এই সুরে কাছে দূরে জলে-স্থলে বাজায় বাঁশী

He sang to them of the lotus heart of love
With all its thousand luminous buds of truth

বিকশিত বিশ্ববাসনার মূলে যে শতদল পদ্ম সেই ত শোধিত হয়ে সত্যের রূপ নেয়, তারই সহস্র সহস্র বিকাশের গান গাইলেন দেবর্ষি।

Which quivering sleeps veiled by apparent things

যা আপাতদৃষ্ট সত্তার মধ্যে কম্পমান হয়ে ঘুমিয়ে থাকে

It trembles at each touch, it strives to wake

প্রতিস্পর্শে এ চঞ্চল হয়ে ওঠে, জেগে উঠতে চায় এবং একদিন

It shall hear a blissful voice
And in the garden of the spouse shall bloom
When she is seized by her discovered lord.

শুনতে পাবে সেই চিরন্তনী আনন্দের বাণী যা কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশবে। সেই চিররমণের উদ্যানেই তার হৃদয়ের ফুল ফুটবে এবং সেইদিন সে শুধু পতিকে আবিষ্কার করবে না, পরমপতি রাস-রসিকও তাকে জোরে গ্রহণ করবেন। কবির উপমা হলো—

Seized by her discovered Lord

একজন করবে সম্পূর্ণ আবিষ্কার, আর একজন করবে সজোরে গ্রহণ। মনে রাখতে হবে যে কবির অবচেতনায় এই মিলন at one and every point of time, অর্থাৎ নিত্যরাস।

এই অনুভূতির মধ্য দিয়েই শ্রীঅরবিন্দের প্রেমব্যাখ্যা। রবীন্দ্রনাথ বলতেন "আবেগের মুখটা যখন নিজের দিকে তখন ভাললাগা, যখন

অন্যের দিকে তখন ভালবাসা। ভালোলাগায় ভোগের তৃপ্তি, ভালোবাসায় ত্যাগের সাধন। স্বাস্থ্য যেমন প্রাণের পূর্ণতা, সৌন্দর্য যেমন রূপের পূর্ণতা, ভালোবাসা তেমনি অনুভূতির পূর্ণতা"। কিন্তু এই প্রেমসাধনা বা পূর্ণত্ব লাভ তখনি সম্ভব যখন সাধকের সাধনা প্রাণস্তরের বাসনার মিশ্রণ থেকে মুক্ত, আসক্তি ভগবদ্‌মুখী, হৃদয়াবেগগুলি শুষ্ক নয় কিন্তু নিবেদিত। এই আন্তর অনুভূতি ও তার বহির্বিকাশের মধ্যে সাম্যরস বিধান থাকা চাই। লাওসে বললেন—রহস্যের আধার আর রহস্যের প্রকাশ দুই-ই এক। চৈনিক দার্শনিকের মতে পূর্ণত্বই তার একমাত্র পরিচয়।

যে তাও কর বর্ণনা— পূর্ণ নয় সে তাও
যে নামে দাও পরিচয়, পূর্ণ নয় সেই নাম। (তাও গ্রন্থ)

এই অদ্বয় অন্বয় জ্ঞান যেখানে সম্ভব সেখানে মৃত্যুর সঙ্গে বোঝা-পড়া করতেই হয়—মৃত্যু মানেই খণ্ডতা, মৃত্যু মানেই দ্বৈতকে স্বীকার। তাই সত্যবানের মৃত্যুর পর সাবিত্রী যমকে বললেন—

I bow not to thee ; O huge mask of Death—
Consciousness of immotality I walk—a victor spirit—মৃত্যুদেব আমি তোমাকে স্বীকার করি না। Mask কথা ব্যবহার করে কবি বলতে চাইলেন যে মৃত্যু একটা মুখোস— অনন্ত জীবনেরই আবরণ। সেই পরম কল্যাণতম রূপকে দেখতে গেলে পূষণকে বলতে হয় অপাবৃণু—খোলো, খোলো দ্বার, তোলো তোমার যবনিকা।

মৃত্যু হাসে—বলে, কিসের শক্তিতে তুমি বিশ্ববিধাতার চিরন্তন বিধানকে উল্টে দিতে চাও নারী,

সাবিত্রী বলে—My God is Love, swiftly suffers all প্রেমের ঠাকুরই আমার দেবতা, আমি সব দুঃখ ভোগ করছি ঃ

I am woman, nurse, slave and beaten beast,
the coveted Queen, the pampered doll
I am in all that suffers and cries

—আমি রমণী, আমি সেবিকা, আমি দাসী, আমি নির্যাতিতা, আবার আমি গরবিনী রাণী, আদরিনী, সব কিছু দুঃখের মধ্যে আমিই জাগরী, আমিই ক্রন্দসী।

I shall remake thy universe O ! Death

নতুন করে এই বিশ্বকে আমি গড়ে তুলবো।

যমরাজ হেসে বলে—বাতুল—I Death am—there is no other God. আমিই একমাত্র দেবতা, সোহং এক ছাড়া দুই নেই—আমার মধ্যেই তোমার বিকাশ, তোমার প্রকাশ, সেখানে সাবিত্রী নেই, সত্যবান নেই- সেই পরম নেতিত্বময় একের মধ্যে প্রেম নেই, ভালবাসা নেই, অমৃতত্ব নেই—তিনি চরম একাকী অনন্ত—আমি তারই প্রতীক।

সাবিত্রী বললে—প্রভু, তুমি ভুল করেছো, সেই নেতির মধ্যেই আছে ইতি—Everlasting yes. মাতৃশক্তি সেইখানেই বিকশিত, ঐ নিরূপাধিকের উর্ধে—জল স্থির থাকলেও জল, হেল্‌লে দুল্‌লেও জল—তাই সে বলছে

I am, I love, I see, I act, I will—

আমি আছি, অয়মহং ভো, আমি ভালবাসি, মহাভাবে প্রাণারাম হই আমি, আমিই দ্রষ্টা পুরুষ, আমি কাজ করি, যন্ত্র শুধু নই, যন্ত্রীও, আমিই ইচ্ছা করি—অহং মনুতে, যমরাজ, তুমি ভুল করেছো—নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয়, নির্বিকল্প, সবিকল্প, negative ও positive এই দুই নিয়েই তিনি।

যমরাজ তখনও তর্ক করেন—You should know তোমায় জানতে হবে—বিজানীয়াৎ—বিজ্ঞানী হতে হবে—বিপুল বিরাট্, বিশাল, সম্যগের যে জ্ঞান। সাবিত্রীর উত্তর অত্যন্ত স্পষ্ট—When ! I have loved for ever I shall know—আমার জানা তখনি সম্পূর্ণ হবে যখন আমি ভালবাসবো চিরকালের জন্য

My coming to life was a wave from God—
Man was born···with a mind and heart to
conquer thee—

আমরা এসেছি সেই অসীম তরঙ্গেরই একটি ভঙ্গী হিসাবে, মৃত্যুর খণ্ডতাকে জয় করবার মত মন ও মানস নিয়ে। মানুষকে বললে চলবে না।

I am the seeker who can never find
I am the fighter who can never win
I am the runner who never touched his goal

আমি পারছি না, আমি পাব না, আমার জয় হবে না, আমি পৌঁছব না সেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে।

মানুষ যখন প্রার্থনা করে—Human I am, human let me remain, আমি মানুষ, আমাকে মানুষই থাকতে দাও—তখন সে ভাবে অতিমানুষী কল্পনার দরকার কি, তখন সে শুধু একটি কথা ভুলে যায়—God lives hidden in the clay—ঐ কাদামাটির মাঝেই তিনি আছেন—দাঁড়িয়ে আছেন তিনি গানের ওপারে নন—এপারেই—এইখানেই—আমার নন্দলালা, আমার প্রিয়, প্রিয়তর, প্রিয়তম—আমার সব—আমার পূর্ণ, আমার জীর্ণ—তাঁরই চরণচিহ্ন সব জায়গায়—ঈশা বাস্য মিদং সর্বং—সর্বং খলুমিদং—তিনি এই মর্ত্যের আবরণের মধ্যে, এই মৃত্তিকার মধ্যে, এই কামকামনালোভলালসার মধ্যে—তারই মধ্যে লুকিয়ে আছেন তিনি—ভাগবত বীজ সেখানেও সুপ্ত। তাকেই জানতে হবে, তাকেই জাগাতে হবে, গণ্ডীকে বাড়িয়ে দিতে হবে, কামকামনাকে দূরে ফেলে নয়, আপ্তকাম হয়ে সত্যকাম হয়ে—নবা অরে পুত্রস্য প্রীতিকাময়ে পুত্র প্রিয়ো ভবতি—সেই আত্মনের প্রীতির জন্য।

কবির অপরূপ ভাষায় তাই সাবিত্রী বললেন—
Our earth starts from mud and ends in sky.

মাটিতে আরম্ভ সেই জীবনের, সেই জগতের, আকাশের পরমে তার শেষ—দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ। রূপান্তরিত করে নাও, পরিশোধন করে নাও—When Unity is One, strife is lost.

সেই বিরাট প্রেমের জীবনে, পরম নামের সঙ্গে যুক্ত হতে পারলেই —সেই ত পূর্ণযোগ—তখনি বলতে পারবো—প্রভু তুমি হেরে গেলে —Strife is lost.

And all is known and all is clasped by love
My love eternal sits enthroned in God's calm
For love must soar beyond the very heaven
It must change its human ways to ways divine

এই যে প্রেম, এই যে ভালবাসা, এই যে শাশ্বতী মিলন, একে শুধু বদলে নেওয়া—কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছার স্বরূপ করে নেওয়া, কেন—

Not for my hearts sweet poignancy
Not for my happy body's bliss alone
I have claimed from thee, the living, Satyavan
But for his work and mine, our sacred charge.

আমার নিজের সুখের জন্য, দেহের ভোগের জন্য নয়—জগদ্ধিতায় —আমাদের এই যুক্ত জীবন মুক্তবেণীর জন্য—

Our love is the heavenly seal of the Supreme
For love is the bright link twixt earth and heaven
Love is the far transcendent's angel here
Love is the man's lien on the Absolute

প্রেমই হচ্ছে স্বর্গ ও পৃথিবীর সেতু, দিব্যের বাহন, সেই এক ও অনাদির কাছে মানুষের ছাড়পত্র।

যম তখনও বলে চলেছেন—মানুষ—Two-legged worm. দ্বিপদ কৃমিকীট সে হবে Divine—দিব্য—তুমি কি মনে করো ঐ সত্যবানই একমাত্র মানবতার প্রতীক—কালে তুমি সত্যবানকে ভুলে

যাবে—তুমি ফিরে যাও—নতুন সৃষ্টিতে মন দাও, পুত্রবতী হও—কিন্তু দিব্যের সাযুজ্য চেয়ো না, কারণ তুমি তা নও, তুমি তা পাবে না, পারবে না।

সাবিত্রী অচল, অটল, দৃঢ়, অচল—রবীন্দ্রনাথের মহুয়ায় দেখেছি কবি প্রেমের একান্ত তপস্বিনী একাকিনীকে নিয়ে গেছেন অনন্তমেয় ঊর্ধ্বের রাজ্যে—

যে মুক্তি রয়েছে লীন বন্ধহীন শান্ত অন্ধকারে
অরণ্যে অরণ্যে আজি সাগরে সাগরে
জনশূন্য তুষার শিখরে
কোন মহাশ্বেতা কোন তপস্বিনী বিছালো অঞ্চল
স্তব্ধ অচঞ্চল
অনন্তেরে সম্বোধিয়া কহিল সে ঊর্ধ্বে তুলে আঁখি
তুমিও একাকী।

এও অপূর্ব উপলব্ধির রাজ্য—শ্রীঅরবিন্দ আর-এক ধাপ এগিয়ে বললেন—তুমিও একাকী, আমিও একাকী নয়, আমরা সব সময়েই মিলিত—সে মিলন অনন্ত, অসীম রসলীন—তার মধ্যে মৃত্যুর অধিকার নেই, খণ্ডের বোধ নেই, নিয়তির নির্দেশ নেই।

সাবিত্রী প্রেমের সেই ঊর্ধ্বতম সুদূরতম রাজ্যে উঠে এই কথাই যমরাজকে বললেন, হঠতে হলো তাঁকে, সেই কালপুরুষকে

I am a deputy of the aspiring world
My spirit's liberty I ask for all

ঊর্ধ্বাভিমুখী যে মানুষের মন, এই যে পৃথিবী, তপ্ত ক্লান্ত, আতুর পৃথিবী—তারই আমি প্রতিনিধি—আমি ফিরিয়ে চাই আমার স্বাধীনতা, সকল মুক্তিকামী মানুষের জন্য।

Release the soul of the world called Satyaban

ফিরিয়ে দাও সত্যবানকে—এ বাণী অমোঘবাণী।

যখন বৈষ্ণব কবি বলেন

ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ লীলা রস
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণে বশ

প্রেমরস পরিপাক করে যে বিশেষ রস, সেই তো রাস। শংকর ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয়তার দিকটার উপরই জোর দিয়েছিলেন, পুরুষোত্তমের দিকে নয়, যে পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথের ভাষায়

মূরতি ধরিয়া জাগিয়ে উঠে আনন্দ

কেবলানুভবানন্দ স্বরূপ যে তিনি, সংস্কার যুগলোজ্জ্বল, রসানাং রসতম, বামনী, পীরিতিময়, রসময়। শ্রীরামকৃষ্ণই প্রথম বললেন এযুগে, যে তিনি একরূপে নিত্য, আর একরূপে লীলাময়। শ্রীঅরবিন্দ সেই কথাটাই আরো এগিয়ে দিলেন,—নেতি নেতি নয়, ইতি, ইতি। তাই তো 'অয়মহং ভো' আমি আছি, এই বাণীর উপাসক কবির ছন্দে জাগলো

আমার আহুতি দিনশেষে
করিলাম সমর্পণ তোমার উদ্দেশে
লহ এ প্রণাম
জীবনের পূর্ণ পরিণাম

এই পূর্ণ পরিণামের কথাই সাবিত্রীর ব্রতকথা। তার জন্য চাই একটি শুচিশুভ্র পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন, আলোর কমলদলের মত আত্ম-উন্মীলন। সারা জীবন হয়ে উঠবে প্রেম, প্রেম হবে প্রণাম, প্রণাম হয়ে উঠবে গান আর সেই গান সমাপ্ত হবে শুধু নীরব পারাবারে নয়, সব পারাবারে, শুধু বেদনার পাত্রই ভরবে না, integrated সত্তার পাত্রও রূপান্তরিত হয়ে ভরে যাবে অপূর্ব অমৃতে। এই পরিপূর্ণ জীবনের কথাই কবি শ্রীঅরবিন্দ বলতে চেয়েছেন—এই হচ্ছে পরিপূর্ণ যোগ। তাই ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথের দিব্যদৃষ্টিতে জেগে উঠেছিল

আছো জাগি পরিপূর্ণতার তরে সর্ব বাধাহীন

প্রত্যেক মানুষ সেই পরিপূর্ণতার জন্য জেগে থাকবে এই শ্রীঅরবিন্দের সাধনা—A divine life in a divine body. তাঁর কাব্য সেই অভীপ্সারই ছন্দময়, বাঙ্ময়, বাণীময়, গীতিময় পরিচয়।

So the light grows always.

আলো, আলো, আরো আলো!

রবীন্দ্র চেতনার কেন্দ্রে বসে আছেন এক মানুষে মানুষে মিলিয়ে নরদেবতা—যার অন্তরে অন্তরে প্রাণের ক্রিয়া, যার সমস্তটাই গতি, যিনি রূপলোক থেকে রসলোকে চলেছেন, কিন্তু সে যাত্রা আলোর রাজ্যে, সাবিত্রীর দেশে, মহা বিকিরণের পথে, জ্ঞানে কর্মে ভাবে,

চলতিকালের চাঞ্চল্যে আবার চিরকালের
স্তব্ধতায়, চরম সংগীতের গভীরতায়,
স্বৃষ্টিকে চরিয়ে চরিয়ে নিয়ে চলেছি,
যুগ হতে যুগান্তরে
নব নব চারণক্ষেত্রে।

* * * *

ডাক দিয়ে নিয়ে গেছি মহাসমুদ্রে,
সে সমুদ্র আমিই।

সেই প্রসারণের মধ্যেই কবি কল্পনা করেছেন তাঁর মহৎকে, তাঁর মহামানবকে। শ্রীঅরবিন্দের চেতনার মূলে আমরা পেয়েছি এই তরঙ্গমুখর মহাসমুদ্রের গতিকে জাগৃতিকে যিনি সব শেষের স্থিতিতে নিয়ে এসে রূপান্তরিত করে, রসস্নিগ্ধ করে পূর্ণমিদমের আসনে বসান সেই আদ্যাকে, সেই মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিকে, সেই পরমাকে।

তাইতো বাউলের গান মনে পড়ে—

যেদিন জনম্ সেদিন আমি দীক্ষা পেয়েছি
এক অক্ষরের মন্ত্র মায়ের ভিক্ষা পেয়েছি।

পরিশিষ্ট

কোন্ রবীন্দ্রনাথ

কবি একদিন গেয়েছিলেন,

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে
বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে।
চুকিয়ে দেবো বেচাকেনা, মিটিয়ে দেব লেনাদেনা
বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে।
আমায় তখন নাই বা মনে রাখলে
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাই বা আমায় ডাকলে।

একথা আমরা শুনিনি, মানিনি। বছরে বছরে কবির জন্মদিন, জন্মপক্ষ, জন্মমাস উপলক্ষ্য করে আমরা তাঁকে স্মরণ করি, বরণ করি, তাঁর পুণ্যনাম গ্রহণ করি, নৃত্যগীতে মত্ত হই, আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। তাঁর দর্শন, তাঁর কাব্য, তাঁর মনীষা, তাঁর সাধনা, তাঁর শিক্ষাব্রত, তাঁর স্বাজাত্যবোধ, তাঁর বিশ্বমানবতা, দেশ ও দশের প্রতি মমতা, মাটির প্রতি ভালবাসা, কত কথাই শোনাই, কত গুরুগম্ভীর নিবন্ধই লিখি, ভাবে ভাষায় গদ্‌গদ্ হয়ে বলি—জয় হোক্ তোমার, হে আমার সোনার বাংলার কবি, হে আমার ভারতের জনগণমনের কবি, হে আমার বিশ্বের মিলনতীর্থের কবি।

বাঙালীর সম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে যে, আমরা একটু ভাবপ্রবণ জাতি। সেটা দুর্নাম কি সুনাম তা জানি না, তবে বাংলা দেশের আকাশে বাতাসে শ্যামল পথছায়ায়, তালীকুঞ্জের দীঘলদীঘির ধারে বোধহয় একটা নমনীয় গুণ আছে, যাতে আমরা কালে অকালে, কারণে

অকারণে উচ্ছ্বসিত ও গদগদ হয়ে পড়ি—সভা করি, সমিতি করি, বক্তৃতা করি, কবিতা পড়ি, উৎসব করি, বার্ষিকী করি, জয়ন্তী করি, খোল করতালের সঙ্গে নৃত্যে উন্মত্ত হই, পথের ধূলাকে ব্রজের রজঃ বলে গায়ে মেখে মাটিতে কাদায় গড়াগড়ি দিই। কোন জিনিসেরই আতিশয্য ও মাত্রাহীনতা অসংযমেরই পরিচয়, একথা ভুলে যাই। হয়তো এটা আমাদের ভেড্ডিড ইণ্ডিড মেলনিড বাঙালীর রক্তের temperamental imbalance বা জীবনযুদ্ধে হেরে-যাওয়া মনের পলায়নী মনোবৃত্তি বা frustration-এর পরিচয়। কবিকে জানি না, বুঝি না, চিনি না, পড়ি না, সে আগ্রহও নেই, চিন্তাও নেই, কিন্তু কোমর বেঁধে লেগে যাই জন্মদিনের উৎসবের মহড়াতে।

গত বছর মহাজাতি-সদনে রবীন্দ্রজয়ন্তীর এক অধিবেশনের উদ্দেশে বেরিয়েছি, দেখা হলো এক বিশিষ্ট সমালোচক বন্ধুর সঙ্গে, এঁর মতের ও পথের প্রতি আমার সুগভীর শ্রদ্ধা আছে, অনেক গব্য পদার্থ ঘেঁটে এঁর বিরাট গবেষণা, যুক্তিবাদী সরস বৈজ্ঞানিক মন—বললেন, আরে, এই যে চলেছেন দেখছি কবিপূজার কার্নিভালে, নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে, দেবতা নাই ঘরে—

আমি হেসে উত্তর দিলাম, কার্নিভাল কোথায় দেখলেন, বলুন, কবিতীর্থে, মহামানবের পরিপ্রেক্ষণিকায়।

তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, থাক্, ভাষার জ্ঞান ত' ঐ রবীন্দ্রনাথ থেকেই ধার করা, সেই ব্যঞ্জনই মশলা সহযোগে পরিবেশন করবেন আপনারা ভাবের ফোড়ন দিয়ে, উপাদেয় বটে, কিন্তু অতি-ভোজনের উদ্‌গারও ওঠে। সেই নিরভিমান, নিরুপদ্রব ভদ্রলোকটি সংসার ছেড়ে দিব্য নিশ্চিন্ত আরামে ইন্দ্রলোকের প্রবালকক্ষে বসে উর্বশীর নৃত্যকলা দেখছেন, না হয় সুরগুরুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছেন বড় জোর শুক্রাচার্যের সঙ্গে কচ ও দেবযানীর কথা—তাঁকে হঠাৎ টনক্ নড়িয়ে দেওয়া কেন, মর্ত্যকায়ায় তিনি কি করে গেছেন, স্বর্গ-

ছায়ায় কী আর তাঁর মনে আছে তা? এ মশায় প্ল্যানচেট্ নয়, প্লেন চীট্—চারশো বিশ ধারা—সত্যি করে বলুন তো, কোন্ রবীন্দ্রনাথকে চান আপনারা?

আমি ভয়ে ভয়ে বলি, আপনি দেখছি, বড়ই সিনিক্।

হেসে বললেন, মাভৈঃ, যেতে দিন, কিন্তু কোন্ রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হবে আজ আপনাদের বিরাট ভাষণে,—কবি, নাট্যকার, পোয়েট্, পেট্রিয়ট্, এসব ত সেকেলে পুরানো—

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী—

আলাপচারীর না পথচারীর, মানুষ রবীন্দ্রনাথের না সাধক রবীন্দ্র-নাথের, জোড়াসাঁকোর ধারের না-মংপুর, শিক্ষাব্রতীর না নৃত্যবিদের, কলাকুশলীর না উপনিষদজ্ঞের, ঋষির না মহর্ষির পুত্রের, বাঙালী কবির না বিশ্ববরেণ্যের, রসিক রবীন্দ্রনাথের না পুরুষোত্তমের···

আমি বললাম, থামুন, থামুন মশাই, তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষণেক তিষ্ঠ, যাবৎ মধুপিবাম্যহম্, মধুপান করতে দিন, আপনার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবো না, ফলে পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পপাত ধরণীতলে।

তিনি বললেন, দেবতাদের অষ্টোত্তর শতনাম থাকে এ বুঝি জানেন না, তবে আরো শুনুন, জমিদার নন্দন, শিলাইদহবাসী পদ্মাবিহারীকে আজ গদ্যে-পদ্যে টেনে নিয়ে আসবেন, না ভুবনভাঙার ভুবনজয়ী বংশীধারীকে, না শ্রীনিকেতনের হলধারী কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন—

কথার স্রোতস্বতীর তোড়ে ঐরাবতও ভেসে যায়, আমি ত' ছার, সামান্য মানুষমেষ। তখনও বলে চলেছেন বন্ধুবর, রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া না প্রোলেটেরিয়াট্ কবি বলবেন, জাপানে গিয়ে যিনি দেখলেন ন্যাশানালিজমের ভূতকে, না রাশিয়ায় গিয়ে যিনি কমিউনিজমের সদ্যঃ পক্ব ফলকে আরক্তিম অবস্থায় বৃক্ষশাখে দোদুল দেখলেন, না যিনি চেকোশ্লোভাকিয়ায় পেলেন প্রণাম, জার্মানীতে 'রাজবদন্নুত ধ্বনি'র

সঙ্গে রাজকীয় সম্মান, ফ্রান্সে জোগালেন কৌতুকের খোরাক, খাস ইংরাজনবীশের এলাকায় যাঁর ভাগ্যে জুটলো প্রচুর অবহেলা।

এতক্ষণে তিনি আমার দিকে তাকালেন। আমি উত্তর দিলাম, আমার রবীন্দ্রনাথ অভিজাত রবীন্দ্রনাথ, পেস্তাবাদাম, আঙুর, বেদানা খাওয়া নিটোল কান্তিমান পুরুষই নন্—সব বিষয়ে, সব সময়েই যিনি এরিস্টোক্র্যাট্, দেহের কান্তিতে, মোহের মুক্তিতে, রক্তের কৌলীন্যে, চলনে, বলনে, ভাষায়, ভঙ্গিতে, মননে, ধ্যানে, চিন্তায়, বেদনায়, কামনায়, কথায়, সৃষ্টিতে, The great aristocrat, the great Sentinel, অধিমানসলোকে যাঁর অধিষ্ঠান।

সর্বনাশ! একে অভিজাত তায় অধিরক্ষক তায় অধিমানস, শিক্ষার বিরোধের সঙ্গে শিক্ষার মিলন লাগিয়ে দিলেন—ভবেত্যেক নীড়ং। আপনি সত্যিকারেরই সেকেলে, যেটুকু আশা ছিল আপনার উপর, তাও গেলো—আজকাল আবার অরবিন্দচর্চায় লেগেছেন বুঝি। চলি মশাই। যা খুশি বলুন গে, কেউ শুনবে না, শুনলেও বুঝবে না, বুঝলেও মনে রাখবে না, কাল সকালে কাগজে নামটা বেরুলেই হলো, সুবিধে হয়ত ছবিটা'র ব্যবস্থাও করিয়ে নেবেন, নমস্কার—

হঠাৎ মনে হলো বন্ধুবরের রহস্যের মধ্যে একটা অন্তঃশীলা ব্যথার নির্ঝরণী আছে যা নির্মম হলেও সত্য। হয়তো আমরা যা লিখি বা বলি তার মধ্যে আছে কিছুটা মিথ্যা বাগাড়ম্বর, হয়তো সেটা পাণ্ডিত্যের তকমালাগানো হঠাৎ আলোর ঝলকানি, হয়তো অহমিকাপূর্ণ বিভ্রান্তিতে ভরা, নয়তো কবির নামে নিজেকে জাহির করবার একটা বিরাট আত্মপ্রবঞ্চনা। 'হয়তো' বললাম এই জন্য যে কবির নামে এই যে রসের মেলা, উদ্যোগের খেলা, এই যে আসর, বাসর, সংঘ, সংঘারাম, সম্প্রদায়, সম্মেলন, উৎসব, অনুষ্ঠান, অনুশীলন, মর্মোদ্ঘাটন, এই যে পঁচিশে বৈশাখকে অবলম্বন করে হৈ হুল্লোড়, জলসা, গান, কবিতা,

বক্তৃতা এর ভিতর কিছুটা আন্তরিকতা নেই, কিছুটা প্রাপ্তি নেই, কিছুটা বৈদগ্ধ নেই, একথা মন স্বীকার করতে চায় না। তবু সন্দেহ থেকে যায়, সংশয়ের নিরসন হয় না, মন নিভৃতে বলে—এ হচ্ছে বেশীর ভাগই দাদার চৌপদী আওড়ানো, মহাপঞ্চকের মহাত্রোটকের ছন্দে কারণপানমত্ত ভৈরবী চক্রে তান্ত্রিকের নৃত্য—স্ফট্ স্ফট্ স্ফোটয়, ঘুণ ঘুণ্ ঘুনাপয়,—এ ঘুণলাগা মনের বাহ্বাস্ফোট মাত্র। বহ্নিমান্ দেবতার আসল রূপটিকে আমরা ধরতে পারিনি, যে অগ্নিমীলে—যাঁকে আমরা নমস্কার করি, যে-অগ্নি আমাদের নিত্য পুরোহিত, যিনি সাগর ছেঁচে রত্ন দান করেন, শুধু কল্যাণী লক্ষ্মীকে নয়, উষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতাকেও, শুধু অমৃতের ভাণ্ডকে নয়, মৃত্যুনীল বিষকেও। তাই মনে মনে বললাম, আমার কবির রূপটি ত শুধু পেলবতার সৌকর্যে ঘেরা নয়, যাঁর গলায় কুন্দফুলের মালা তুলবে, বুকে থাকবে শ্বেত চন্দনের ছাপ। আমি দেখেছি সেই কবিকে যাঁর চোখের দৃষ্টি চলে গেছে দিগন্তের পারে, যাঁর সব কটি বীণার তার উতলা হয়েছে, মাটির সঙ্গে যাঁর বিচ্ছেদ নেই, স্বর্গের সঙ্গে যাঁর মিলন অচ্ছেদ্য; যাঁর অদম্য সত্তা, অনম্র ব্যক্তিত্বের কাছে হার মেনেছে সবাই, যিনি কোমলে কঠোরে মেশানো চন্দ্রভানু, পার্বতীর মুখের পানে ধূর্জটির হাসিকে নিয়ে যিনি অর্ধনারীশ্বর, যিনি মধুর, যিনি বিধুর, যিনি প্রিয়ার কণ্ঠবিলগ্ন, যাঁকে শোনা যায় ক্বণিত কঙ্কনের চকিত ঝংকারে, যাঁকে দেখা যায় প্রবালের রক্তিম তটরেখায়, যাঁকে চেনা যায় অনির্দেশ্য বেদনার ক্ষেপা সুরে, হয়তো বা নতুন ফোটা বেলফুলের মালাতেও। আবার যিনি মত্ত সিংহাসনে আসীন, মানুষজন্তুর হুহুংকারে, ক্ষুধিতের বিড়ম্বনায়, অতৃপ্তের প্রবঞ্চনায়, পাষাণীর পাষাণকায়ায়, ঝড়ঝঞ্ঝার মঞ্জীরে গেয়েছেন—

আজ বেদমন্ত্রে হে বজ্রী তোমার করি স্তব
তব মন্ত্ররব
রৌদ্ররাগিণীর দীক্ষা নিয়ে মোর শেষ গান

আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
রূঢ় পৌরুষের ছন্দে
জাগুক্ হুঙ্কার
বাণীবিলাসীর কণ্ঠে ব্যক্ত হোক্ ভৎ´সনা তোমার।

মহাকাল সিংহাসনে সমাসীন বিচারকের কাছে যিনি চেয়েছেন শক্তি দাও শক্তি দাও মোরে, কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী। এই বহ্নিমান মধুমান কবিরই জয় যেন গাই, গাঁথি খ্যাত অখ্যাত ব্যর্থ চরিতার্থতার জটিল সংমিশ্রণে—

নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা

তাই আজ আমরা কোন বিশেষ রবীন্দ্রনাথকে পূজার বেদীতে বসাবো না, আবাহন করবো সেই নীলকণ্ঠকে, সেই বীর্যবানকে, সেই মানুষী তনুমাশ্রিত আদর্শকে, অব্যয় ভাবধারাকে। সেই তপস্বী মনস্বী যুক্তি-তত্ত্ব শুনতে 'তত্ত্বশিরোমণি'র কাছে যান নি, বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন শিখেছেন, যিনি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করেননি, চোখ মেলে এমন দেখা দেখেছেন যে তাতে তাঁর চোখ কখনও ক্লান্ত হোল না।

স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু

তাই আজকের রবীন্দ্রজয়ন্তী যেন শুধু পেলবতার কোমলতার আবাহনই না আনে, শুধু চাঞ্চল্যের দোল, রক্তিম হিল্লোল নয়, কামিনীতে রমণীতে ধরণীর ধমনীতে বসন্তের মধুরাত্রের কল্পনাই নয়—এখানে আসুক সুস্থির সুঠাম চিন্তা, আদিম প্রাণের আতিথ্য, ক্ষমাস্নিগ্ধ বুক, জীবনের প্রতি সৌজন্যবোধ, বিদগ্ধ মনের নিষ্কলুষ আলোচনা, জনগণের মনমন্থিত স্বতঃউচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত একটি প্রণাম,—কবির নিখিল রসামৃতভাবমূর্তি। এই পূর্ণতা, এই আন্তরিকতার গীতি যদি পাওয়া যায় তবেই জয়ন্তী উৎসব গড়ের মাঠের বাত্তি ছাড়িয়ে, পল্টনী-কায়দা এড়িয়ে, কুইক্ মার্চের ব্যবস্থা, মাইকের চীৎকার, ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি, আত্মাভিমান আর হতাশ মনের প্রতিক্রিয়া কাটিয়ে উঠবে

তার সার্থকতার তীর্থে, যেমন কোন একদিন হঠাৎ শোনা একটি সুরকে নিজস্ব করে পাওয়া যায় গভীর রাতে, আকাশের নীচে, সেতারের তারে, মৃদু বেহাগের আলাপে, যখন আপনি মনে হয়—

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।

আসলে কে কি পন্থী, কার সুরা কতটা উগ্র, কার মনের রোমন্থনে কতটা হলাহল আছে, জীবনের মাপকাঠিতে সেইটেই শেষ পর্যন্ত বড় কথা নয়—আসল বক্তব্য হচ্ছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্য পরিচয় কোথায়, আমি কী ছিলাম আর কী হলাম, অবশ্য খাওয়াপরা জীবনযাত্রার একটা সুষ্ঠু মান থাকা চাই, কল্পলোকে বাস করে শুধু কবিতা লিখলেই চলে না একথা মানি, কিন্তু ততঃ কিম্। কাব্যকথায় দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরি নয়, মানুষে তৈরি, বারে বারে তিনি বলেছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বের প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করেননি তিনি। আবার তিনি হয়তো বহুর গান শোনাননি—যারা বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে, টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল। কিন্তু শতশত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে যারা কাজ করে তাদের কথা বিস্তৃতভাবে না বললেও তাঁর মনে ঐকতান বাজছে—

নিজে যা পারিনি দিতে নিত্য আমি থাকি তাঁর খোঁজে
সেটা সত্য হোক

সেই খোঁজাই হয়েছে সত্য, বহুতরের সুর মিলেছে সেখানে, বৃহতের মহতের, বহুতমের অভীপ্সায়, যাতে—

ভস্ম যেন অগ্নি হয় প্রাণ যেন পায় প্রাণহারা।

জানি এখনি তার্কিক তর্ক তুলবেন, পণ্ডিত বন্ধুর দল মুখ ঘুরিয়ে বলবেন ভাষার ঝংকারে, ভাবের মোহে মনের দৈন্য চাপা দেওয়া যায় বটে কিন্তু মকরচূড় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে Subjective adulation-এর দিন চলে গেছে, Objective Valuation-এর সময় এসেছে। তাঁর কাব্য-চেতনায় বড় জোর একটি Vague synthetic unity

of appreciation আছে কিন্তু জীবনরসে জারিত বোধ নেই। তাঁর মধ্যে কল্পনার বেগ ও আবেগ আছে, কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণের দুঃসহ মুক্তি নেই, বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতা নেই, তামসপ্রবেগের খরধারা নেই, Walpurgis' night নেই। আবার আর-একদল বলবেন, কবি যতই মানবধর্ম সম্বন্ধে গালভরা বক্তৃতা দিন তাঁর হিউম্যানিজম মানবকেন্দ্রিক চিন্তা নয়, সেখানে মানবতন্ময়তা, মানবমুখীনতা—Man end in itself নেই—এ একটা ভাসা ভাসা divinity of humanity, humanity of divinity-র খেয়াতরীতে বাওয়া, উপনিষদের চিন্তায়, মরমীদের বার্তায় পুষ্ট জীবনদেবতাবাদ, যেখানে সমাজচেতনা ও ব্যক্তিচেতনার Value বা norm, গুণ ও আদর্শ সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই, কাব্যকুহেলিকায় সব ঘুলিয়ে গেছে, জীবনের গণচেতনা ভাষা ও ভাষ্যের মধ্যে ডুবে গেছে। মানবমুখীন রবীন্দ্রনাথকে খুঁজতে গেলে শুধু তাঁকে কাব্যের মধ্যেই খুঁজবো, না, খুঁজবো তাঁর ছোট গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, যেখানে রোমান্টিক abandon-এর মধ্যেও মেহের আলিরা বলে—সব ঝুটা হ্যায়, তফাৎ যাও, যেখানে মিনির সঙ্গে কাবুলীওয়ালা খেলে, যেখানে ধনঞ্জয় বৈরাগী প্রায়শ্চিত্ত করে, যেখানে পলাতকা লিপিকায় পুনশ্চে বেজে ওঠে সাধারণ মানুষের অতি সাধারণ বেদনার সুর। আমরা ভুলে যাই যে কবিকে বুঝতে গেলে শুধু কবিমানস নিয়েই গবেষণা করলে চলে না—বুঝতে হয় যুগের ইতিহাসকে, জাতির ঐতিহ্যকে, পারিবারিক পারিপার্শ্বিককে, জীবনযাত্রার পারম্পর্যকে—কবি শুধু স্রষ্টা নন্, দ্রষ্টাও। তিনি শুধু আবিষ্কার করেন না, নিজেও আবিষ্কৃত হন। শুধু ধ্বনির আলোকে, রসাত্মক বাক্যের সমষ্টিতেই তাঁর সৃষ্টির শেষ নয়—তার পরেও সে রেশ রেখে যায়—এর সুর এগিয়ে চলে—এর সপ্তক বদল হয়, এর তার বেড়ে যায়। একে নিয়ে যে-জগৎ সৃষ্টি হয়, সেই হলো কবির জগৎ। সেখানে তাঁর ব্যক্তিত্ব অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নয়, এই কথাটা যেন না ভুলি।

তোমারি স্মৃতি

কতদিন আগের কথা—আমরা তখন বালক। পূজোর কয়েকদিন পূর্বে গেছি পিসীর বাড়ী বেড়াতে। দেখি আমারই সমবয়স্ক পিসতুতো ভাই জোর গলায় স্কুলের পারিতোষিক বিতরণী সভার জন্য আবৃত্তি প্র্যাকটিস করছে—আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে, হের ঐ ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে। মনে হোল কথা-গুলো কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল, যেন কোন অপরূপ কল্পনার রাজ্যে গিয়ে পড়লাম—মাতৃহারা যদি মা না পায়, তবে আজ কিসের উৎসব। এক কথায় শিশুচিত্ত হরণ করে নিলে কে, অমিতবিত্তে ভরে উঠলো মন। ছেলেবেলা থেকেই গান ছড়া কবিতার উপর আমার টানটা ছিল বেশী। অহেতুকী কি না জানি না, মনঃসমীক্ষকরা পরীক্ষা করে বলতে পারেন। নতুন ছড়াটা তখনই মুখস্থ হয়ে গেল, কার লেখা, কোন লেখক, কে সে, কোথাকার কবি কিছুই জানি না, জানবার প্রয়োজন বোধ করিনি, ভাল লাগলো এই যথেষ্ট, এই হলো পরম লাভ। শৈশব কৈশোরের সেই অস্পষ্ট আলোকে কবিগুরুর সঙ্গে মনের এই প্রথম মিতালী। পরশ পাথরের স্পর্শে মনে নিজের অজ্ঞাতে প্রশ্নের বীজ বপন হলো "হে গুণী, কোন অপূর্ব রূপটি তুমি সকল কালের জন্য সৃষ্টি করলে।"

কদিন পরেই পূজোর মহোৎসব। সারা বিশ্ব সচকিত করে পুজোর দালান আলোকিত করে মহামায়া নেমেছেন, বিশ্বরমার স্পর্শ পড়েছে। তখনও বাঙালী মধ্যবিত্ত সংসারে ভাদ্রনদীর ভরা স্রোত না থাকুক, অভাব অনটন নিরানন্দের একটানা ঢল নামেনি। দুকূল প্লাবিয়ে

প্রাণবন্যা ফুলতে ফুলতে দুলতে দুলতে না গেলেও জীবনে জোয়ার-ভাঁটা ছিল। দুঃখ কষ্ট তিক্ততা রিক্ততার মাঝেও আসতো উৎসব, উদ্দীপনা, উৎসাহ, উচ্ছ্বাস। সাধ্যমত দীয়তাং ভুজ্যতাং, একের কাজ পাঁচজনে করতো, পাঁচজনকে নিয়েই ছিল গৃহস্থের সংসার। সমাজ-জীবনে বাঁধন ছিল, নিষ্ঠা ছিল, আবার দলাদলিও হোত, হলাহলও ফুটতো; তবু এতটা মুখ বেঁকিয়ে নয়, এতটা ট্যাঁক খালি করে নয়, এতটা অনুদার আত্মসর্বস্ব মনোভঙ্গী নিয়ে নয়। আজ শুধু সমাজ ভাঙেনি, ঘর ভাঙেনি, মনও ভেঙেছে, যে মন গড়তো, যে মন নড়তো, যে মন আশ্রয় দিত নিরাশ্রয় আত্মীয়দের, পক্ষপুটে রাখতো অসহায়দের, শুনতো সন্ধ্যে বেলায় স্তিমিত প্রদীপের নীচে কথক ঠাকুরের কাছে ধ্রুব প্রহ্লাদের কাহিনী, কর্ণের মদায়ত্ত পৌরুষের গল্প, ভক্তিগদগদ নম্রনত চিত্তে।

পুজোর উৎসব-প্রাঙ্গণ জাঁকিয়ে বসে থাকতেন আমার পিতামহ, শুভ্রকেশ বর্ষীয়ান্, গলায় দুলতো সাদা ধপধপে পৈতে। অতিথি অভ্যাগতকে ডেকে নাতির আবৃত্তি শোনানো তাঁর ছিল এক প্রশ্রয়-দান। সেবার কিন্তু গড়িগড়িয়ে আবৃত্তি করলাম—আনন্দময়ীর আগমনে···। দেখলাম প্রখরবিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন হাইকোর্টের প্রবীণ উকীল ঠাকুর্দা মশায় পর্যন্ত বেশ বিচলিত হলেন—ভারী চমৎকার, কার লেখা ···কাছেই ছিলেন আমার পিতা, তখনকার দিনের ইয়ং বেঙ্গল, বয়স ত্রিশ পেরোয়নি, আমিই তাঁর প্রথমজাত। তাঁরা তখন দ্বিজুওয়াইট্ ও রবাইট্ নিয়ে ব্যস্ত, বললেন—রবি ঠাকুরের লেখা···

ও, দেবেন ঠাকুরের ছোট ছেলে—

তখন স্বদেশীযুগ পেরিয়েছে, সারা ভারতবর্ষ না হোক্ সারা বাংলা-দেশ জুড়ে রবীন্দ্রনাথের নাম ঘরে ঘরে। বাংলার মাটি বাংলার জল ধন্য হোক পুণ্য হোক্ বিশ্বভুবনেশ্বরের কাছে এ বলিষ্ঠ প্রার্থনা কে না শুনেছে। কে না শুনেছে "যদি তোর ডাক্ শুনে কেউ না আসে তবে

একলা চল রে।" তবু তাঁদের কাছে তখনও তিনি দেবেন ঠাকুরের ছোটছেলে, নিজের নামে ধন্য নন, পিতৃনামে মধ্যম।

কবির সঙ্গে সেই প্রথম আত্মিক পরিচয় অন্তরের আহিতাগ্নিতে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বালক মন শুধু সুয়োরাণী তুয়োরাণীর কথায়, অভিমানিনী কঙ্কাবতীর ব্যথায় কল্পনায় উধাও হয়ে যায় না তেপান্তরের মাঠে। যখন তুপুর বেলায় বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান, তখন সে মনে মনে কবিকে ডেকে বলে, শিবঠাকুরের বিয়ের গান শোনাও, রঙিয়ে দাও, রসিয়ে দাও, কথা কও, কথা কও। বাড়ীর বৈঠকখানায় একদিন গানের বৈঠক বসলো, বয়োজ্যেষ্ঠদের সে আসরের কাছে যাবার হুকুম ছিল না। দূর থেকেই সা রে গা মার সুরলহরী ভেসে আসতো। একজন গাইলেন "অয়ি, ভুবনমনমোহিনী।" অবোধ শিশুর মনে জাগলো—কে সেই জনকজননী জননী। সেই সময়েই হাতে পড়েছিলো কথা ও কাহিনী। ভাষার ফ্রেমে আঁটা ভাবের আকাশে সে কী নিত্য মহোৎসবের ব্যবস্থা, একেবারে ভূরিভোজ। কবিতাগুলি পড়তাম সুর করে, কিছুটা বুঝতাম, কিছুটা বুঝতাম না, তবু উদ্দাম হয়ে উঠতো মন। কাশীর মহিষী করুণা স্নানে চলেছেন স্বচ্ছসলিলা বরুণায়—কী কৌতুকই কৌতুকময়ী করলেন, কতটুকু ক্ষতি হোল তাঁর প্রজাদের। অনাথপিণ্ডদ প্রভু বুদ্ধ লাগি ভিক্ষা মাগিতেছেন, মহাভিক্ষুকের সাধ কে পুরাইবে। মৈত্র মশাই সাগরসঙ্গমে তীর্থস্নানে যাবেন, মোক্ষলাভের আশায় মোক্ষদা হোল সঙ্গী, সঙ্গ নিলো মাসীর আদরে মানুষ তুরন্ত রাখাল, মায়ের রেগে বলা "চল তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে" যখন সত্যি হোল তখন দেবতার গ্রাস থেকে বাঁচাবার জন্য "ফিরায়ে আনিব তোরে" বলে মৈত্র মহাশয়ের জলে ঝাঁপ, বালকের স্বপ্নে ধ্যানের টুকরোয় আঁকা রইলো চিরকালের জন্য। আবার ওদিকে হোরী খেলছে হাজার রাজপুতানী, পঞ্চনদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে জেগে উঠছে শিখ, বন্দা বন্দী হচ্ছে তুরাণী সেনার

করে, জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন। আর এদিকে সন্ন্যাসী উপগুপ্ত চলেছেন অভিসারে "বর্ষ তখনো হয় নাই শেষ, এসেছে চৈত্র সন্ধ্যা, বাতাস হয়েছে উতলা আকুল, পথতরুশাখে ধরেছে মুকুল, রাজার কাননে ফুটেছে বকুল পারুল রজনীগন্ধা।"

শৈশবের এই অনুরক্তি কৈশোরের আনুগত্যে পৌঁছল। পূর্বরাগ গাঢ় হয়ে উঠলো বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় পৌঁছে নতুন করে পরিচয় হোল কবির সঙ্গে। এরই মধ্যে কাগজে বেরুলো জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারের প্রতিবাদে কবির উপাধিত্যাগের পত্র। সকাল থেকে সে কী উত্তেজনা ছাত্রমহলে সে কথা মনে পড়লে আজও গা শিরশির করে ওঠে—"The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation." ভানুসিংহের পত্রাবলীতে সেই কথাই লিখলেন তিনি—"বুকের মধ্যে অনেক ব্যথা জমে উঠেছিল, তারই ভার আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে, তাই ভারের উপর আমার ঐ উপাধির ভার আর বহন করতে পারছিনে, তাই ওটা মাথার উপর থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করছি।"

প্রথম সত্যকার কবিদর্শন হোল আরও পরে ১৯২১ সালে। তখন দেশবিদেশের প্রণাম কুড়িয়ে তিনি ফিরেছেন দেশে। তাঁর মন ভরে রয়েছে স্বপ্নের সাধনায়, তাঁর বীণা ঝংকার দিচ্ছে "যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ং", মানুষের হিংসা দ্বেষ গ্লানি সবকিছু বিরোধ বিতণ্ডা দ্বন্দ্বের চরম সমাপ্তি যেখানে হবে শিক্ষার মিলনে, সারস্বত অবদানে, সেই একের নামে যিনি সব দেশে সকল কালে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। কিন্তু দেশে তখন অসহযোগের প্রবল বন্যা, নেতির নীতি। আগুন যখন লাগে তখন সবাইকেই জল ঢালতে হয়। বাঁশীর সুরে সে দাবাগ্নি শান্ত হয় না। কবি নমস্য কিন্তু তিনি কল্পলোকবিহারী, Ivory castle থেকে নেমে মাটির দিকে দৃষ্টি দিন্, সবার সঙ্গে হাত মেলান্, জনগণ-

মনের সঙ্গে এক হোন্। সেদিন তিনি দেশবাসীর কাছে এই সব মন্তব্যই শুনেছিলেন। তিনি ইউরোপ আমেরিকায় বলে এসেছেন—ন্যাশানালিজম্ একটা ভৌগোলিক অপদেবতা, শান্তিনিকেতনের দরজায় তার নাম লেখা নয়। অসহযোগের আদর্শ তাঁর কাছে রাজনৈতিক কৃচ্ছ্র তার উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হোত, তাই শিক্ষার সঙ্গে এই বিরোধ তাঁর শাশ্বত মনকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। তিনি বলতেন—ভারতের আছে বহমান্ মননধারা। সে যেমন দিতে পারে তেমনি নিতে পারে। তার মন্ত্র হচ্ছে চরৈবেতে—এগিয়ে চলো, পেছিয়ে পড়ো না, সে বলবে আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা, শৃণ্বন্তু বিশ্বে—। আজ বুঝতে পারি সেদিন ভারতপথপথিক এই কবি ভারতের অন্তরের অন্তরতম ঐতিহ্যকে সযত্নে লালন করেছিলেন একটি ছোট্ট দীপশিখা জ্বেলে রেখে। মহাত্মাজী স্বয়ং এই কথা মেনে তাঁকে অভিবাদন জানিয়েছিলেন "Great Sentinel" বলে।

"শিক্ষার মিলন" সম্বন্ধে এই সব কথাই কবি বললেন ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটের বিখ্যাত বক্তৃতায়। তিনি বললেন—"কালকের দিনের ইতিহাস সার্বজাতিক সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে। যে সকল রিপু, যে সকল চিন্তার অভ্যাস ও আচারপদ্ধতি এর প্রতিকূল তা আগামীকালের আমাদের অযোগ্য করে তুলবে।" এর প্রতিবাদ করলেন শরৎচন্দ্র। কবি আরও জোর করে তাঁর মত জানালেন সত্যের আহ্বানে। সাহিত্যে সুনীতি দুর্নীতি নিয়েও কয়েক বৎসর পরে প্রচণ্ড বিতণ্ডা জমেছিল কবিকে পুরোধা করে, একথাও মনে পড়ে।

ইউনিভারসিটি ইনস্‌টিটিউটের বক্তৃতায় ভিতরে স্থান নাই। বাইরে থেকেই দেবদর্শন হোল চকিতে—বড় মিনার্ভাগাড়ী নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়ালো গেটের সামনে। গোলদিঘীর পার থেকেই নিরাশ হয়ে ফিরতে হলো ঘরে, কিন্তু সুযোগ জুটে গেল কদিন পরেই। আলফ্রেড থিয়েটারে খুলনা দুর্ভিক্ষের সাহায্যে কবির বক্তৃতারই পুন-

রাবৃত্তি হলো, এবারে প্রণামী ছিল, তাই টিকিটটা আগে থাকতেই জোগাড় করা গেল। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সভাপতি, নাটোরাধিপ মহারাজ জগদীন্দ্র মাদল বাজালেন, বাইরে বাদলের গুরুগুরু রব। রবীন্দ্রনাথ সভাস্থলে ঢুকলেন, তূর্য বাজলো, সূর্য এলেন অগ্নিরথে, সে ত আগমন নয়, আবির্ভাব। আচার্যদেব তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। সেই প্রথম তাঁকে অতিকাছে দুচোখ ভরে দেখলাম—সে কী রূপ, সৌম্য সহাস বিকচবয়ান, প্রতিভাপ্রদীপ্ত নয়ন, বালার্কসদৃশ তপ্ত-কাঞ্চন তনু। আর ফাল্গুনীর ভাষায় বলতে গেলে—যেন ওর মধ্যে সকাল হয়েছে, যেন ওর ভুরুর মাঝখানে অরুণের আলো খেয়ানৌকা-টির মত এসে ঠেকেছে। তাঁর দিকে চেয়ে শুধু বিস্ময়ের সীমা থাকতো না তা নয়, তাঁর কথা শুনে বা লেখা পড়ে মনে হোত এর চেয়ে ভালো করে কেউ বুঝি বলতে পারে না। বারে বারে তাঁর কথা মনে পড়ে, তাঁর নিজের কথায়—নববর্ষার দিনে জলভরা মেঘে আকাশের শেষ-প্রান্তে বনের রেখা যেখানে নিবিড় হয়ে ওঠে তখন বসে বসে মনে করি আমার রাজার রূপটি বুঝি এই রকম—এমনি নেমে আসা, এমনি ঢেকে দেওয়া, এমনি চোখ জুড়ানো, এমনি হৃদয়ভরানো, চোখের পল্লবটি এমনি ছায়ামাখা, মুখের হাসিটি এমনি গভীরতার মধ্যে ডুবে থাকা—তুমি স্নান করে শেফালি বনের মধ্য দিয়ে চলেছো, তোমার গলায় কুন্দফুলের মালা, তোমার বুকে শ্বেতচন্দনের ছাপ, তোমার বীণার সব কটি তার উতলী, তোমার হাতে ফুলের মঞ্জরী, তোমার চোখের দৃষ্টি দিগন্তের পারে, তখন মনে হয় তুমি আমার পথিক বন্ধু, তোমার সঙ্গে যদি চলতে পারতাম, তাহলে দিগন্তে দিগন্তে সোনার সিংহদ্বার খুলে যেতো শুভ্রতার ভিতর মহলে প্রবেশ করতে পারতাম আর যদি না পারি তবে এই বাতায়নের ধারে বসে কোন এক অনেক দূরের জন্যে দীর্ঘনিশ্বাস উঠতে থাকে।

এরই ভিতর একসময় কবির সঙ্গে দেখা করতে এলেন মহাত্মাজী।

সেদিন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর আশেপাশে অপেক্ষমান জনতার মনে এই দুই মহামানবের আলোচনার ফল কি হয়, তার প্রতিক্রিয়ার কথা মনে পড়ে। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর বিরোধিতা করছেন বলে তাঁরই বাড়ীর প্রাঙ্গণে বিলাতী কাপড় পোড়ানর লঙ্কা দাহনের লজ্জাটা বহ্নুৎসব ছাড়িয়ে লাল হয়ে উঠেছিল বলে মনে হয়। এ ছিল হরি ও হরের যুদ্ধ। মহাত্মাজীর "গুরুদেব" হলেন রবীন্দ্রনাথ আবার রবীন্দ্রনাথ "গান্ধীমহারাজের শিষ্য কেউ-বা ধনী কেউ-বা নিঃস্ব এক-জায়গায় আছে মোদের মিল"।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্বভারতী সমিতি। সাংলগ্নিক ছাত্রসদস্য হিসাবে আমরা অনেকেই যোগ দিয়েছিলাম। রামমোহন লাইব্রেরীর হলে, জোড়াসাঁকোয়, এম্পায়ারে, ম্যাডন থিয়েটারে বসতে লাগলো আসর, আলাপ আলোচনা অভিনয়। স্বয়ং কবি, অবনীন্দ্রনাথ, দীনু বাবু, আচার্য্য লেভি, প্রশান্ত মহলানবীশ প্রভৃতি গুণীরা যোগ দেন। কবিকে আরো কাছে পেলাম, ধন্য হলাম, কৃতকৃত্য হলাম। কলকাতায় প্রথম বর্ষামঙ্গলের পত্তনও সেইসঙ্গে। কবির সকল গানের ভাণ্ডারী সকল সুরের কাণ্ডারী দীনু বাবুর দরাজ গলা আজও যেন বহু যুগের ওপার হতে কানে মধুবর্ষণ করছে—'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে, জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ-রভসে, ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা'। কবির নিজের মুখে গানও শুনিনি যে তা নয়, তবে যাঁরা তাঁর প্রথম যুগের গলা শুনেছেন তাঁরা বলেন সে কণ্ঠের তুলনাই হোত না বৃদ্ধবয়সের গানের সঙ্গে। যে দুটি গান বিশেষ করে তাঁর নিজের মুখে শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল সে দুটি হচ্ছে "সবার রংএ রং মেশাতে হবে", "লেগেছে অমলধবল পালে মন্দমধুর হাওয়া"। একদিন কবি পড়ে শোনালেন সদ্যলিখিত "মুক্তধারা"। কবির কণ্ঠে সেদিন ফুটে উঠেছিল ভৈরবের আবাহন গীতি, যিনি তিমির হৃদবিদারণ, জ্বলদগ্নিনিদারুণ, মরুশ্মশানসঞ্চর,

শঙ্করপ্রলয়ঙ্কর। চক্রমুখরমন্দ্রিত বজ্রবহ্নিবন্দিত যন্ত্রদানবের বিরুদ্ধে রাজপুত্র অভিজিতের অভিযান রূপকে, দ্যোতনায় অপরূপ হয়ে উঠেছিল। কয়েক বৎসর পরে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের দ্বারা এই নাটকটির একটি সুষ্ঠু অভিনয় দেখি। এই যুগে কবির মুখে "রক্তকরবী" শোনারও পালা। সেদিন প্রস্তাবনায় তিনি যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন সে কথা আজকের রক্তকরবীর বহুল অভিনয়ের দিনে আমরা মনে রাখিনা। অধ্যাপক বিভাস রায়চৌধুরী আমাদের নতুন করে সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সম্প্রতি।—এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' বলে একটি মানবীর ছবি। প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা থাকেনা—সে পূর্ণতা প্রাণের মধ্যে, প্রেমের মধ্যে, সহজের মধ্যে, সৌন্দর্যের মধ্যে, নারীর মধ্যে, নন্দিনীর মধ্যে। যন্ত্র সেখানে পরাজিত, ধুলায় লুণ্ঠিত, প্রেম হয় মন্ত্র। তারপর থেকে যে কয় বৎসর কলকাতায় ছিলাম—ছাত্রাবস্থার শেষে ও কর্মজীবনের প্রথমে, অর্থাৎ প্রায় বারো বৎসর যখনই বিশ্বভারতীর কোন অভিনয় বা গানের পালা হয়েছে, অনুপস্থিত হয়েছি বলে মনে পড়ে না। বরং আজও স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করে বিসর্জন নাটকে যুবক জয়সিংহের বেশে বৃদ্ধ কবির আবির্ভাব চমক্ লাগিয়ে দিয়েছিল সকলকে। এর মধ্যে বিশেষ করে মনে আছে নটীর পূজা ও তপতী। শীতের সে অচপল সন্ধ্যায় শ্রীমতীর নৃত্য ক্ষণিকের জন্য আমাদের নিয়ে গিয়েছিলো আড়াই হাজার বছর পূর্বের অজাতশত্রুর কালে যেদিন শুভ্র শারদ নিশীথে শুভ্র পাষাণফলকে রক্তলিখা পড়েছিল তবু স্তূপমূলে বুদ্ধশরণের মন্ত্র থামেনি। নৃত্যকলার ইতিহাসেও এক নতুন যুগের পত্তন সুরু হয়েছিল সেদিন। ভঙ্গীতে আর সঙ্গীতে নব জনমের মাঝে বন্দনা নেমেছিল।

'রাজা ও রাণী' কবির অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের রচনা। রাজা বিক্রমের প্রচণ্ড আসক্তি ছিল রাণীর প্রতি, সুমিত্রার মৃত্যুতে হোল তার

অবসান। কবির দ্বিধা ছিল এর সম্যক রূপটি বুঝি ফোটেনি রাজা ও রাণীতে। কুমার ও ইলার প্রেমও বাধা দিয়েছে নাটকের মূল ধারাকে। সেইজন্য তাকে নূতন করে লিখলেন তিনি "তপতী"। ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রকাণ্ড উঠোনে যেদিন অভিনয় হোল তপতী সেদিন শেষ দৃশ্যে রাজার বেশে দূরে চিতাগ্নির ম্লানছায়ায় কবির অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে উপস্থিতি নাটকের বিষয়বস্তুকে নাটকীয় চরমে তুলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে গান হচ্ছিল বৈদিক মন্ত্রের।

"উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম"

"বায়ুরনিলমথেদং ভস্মান্তং শরীরং ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর"

"অগ্নে নয়া সুপথে…"

কবির শেষ অভিনয় দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল ১৯৩৩ সালে,চণ্ডালিকা ও তাসের দেশ। গল্পগুচ্ছের 'আষাঢ়ে' গল্পটি তীব্র ব্যঙ্গ নিয়ে দেশকে কশাঘাত করলে। বুদ্ধশিষ্য আনন্দের 'জল দাও' এক অন্ত্যজা চণ্ডালীকে দ্বন্দ্ব দোলা হিংসা রিরংসার মধ্য দিয়ে চিরনারীত্বে প্রতিষ্ঠিত করে দিলে।

রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতে কবিদর্শনে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল, তারপরেও কবিতীর্থে একাধিক বার গিয়েছি। তবু শরৎচন্দ্র যা বলতেন, কবির সঙ্গে কোনোদিন ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ ও সৌভাগ্য ঘটেনি। বাইরে এটা ছিল সত্য কিন্তু অন্তরের সত্য ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মনে হতো এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হতে পারে না। একবার অবকাশে দেশে ফিরেছি। কবিগুরু তখন বিসর্প রোগ থেকে উঠেছেন। কবি-প্রণাম করবার জন্য সপরিবারে শান্তিনিকেতনে গেলাম শিউড়ি থেকে। আমার স্ত্রী শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী, তাঁরই উৎসাহ ছিল বেশী। উত্তরায়ণে গিয়ে প্রতিমা দেবীর সঙ্গে দেখা করতেই তিনি তাকে কবির কাছে নিয়ে গেলেন। চমকে উঠলাম—একী, এ যে বাজপড়া বনস্পতি—তবু স্তব্ধ শান্ত সমাহিত; একটু হেসে বল্লেন, আমার আর কি আছে, কি দেখতে এসেছো।

আমার শিশুকন্যাকে আদর করে বল্লেন, আমায় দেখে ভয় করছে। সেই শেষ দেখা।

শান্তিনিকেতনের কথা মনে হলে মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের দুই সন্ধানীর গল্প "দারুণ দ্বিপ্রহরের রোদ, শিবিকা-বাহকেরাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, হঠাৎ মহর্ষিদেব দেখলেন, সামনে দিগন্তপ্রসারিত মাঠ আর তারই মাঝখানে একটি ছায়াতরু। কী তাঁর মনে হয়েছিল জানি না—হয়ত তিনি দেখেছিলেন বৃক্ষইব দিবি তিষ্ঠত্যেককে·আনন্দরূপং অমৃতং যদ্বিভাতিকে। প্রথম সন্ধানী উদাত্ত কণ্ঠে বল্লেন—তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।" দ্বিতীয় সন্ধানীও সেই কথাই কত সুরে কত গানে কত কাজের মধ্যে বলে গেলেন। লোকে জানে রবীন্দ্রনাথ বড়ঘরের ঘরোয়ানা ছেলে, আঙ্গুর পেস্তা বাদাম বেদানা খেয়ে পরিপুষ্ট নিটোল কান্তিমান পুরুষ। তিনি নিজেই বলতেন, আমার দুর্নাম ছিল ধনীর সন্তান, তার চেয়েও বড় দুর্নাম কবি। তাঁর বেদনার কথা কেউ বুঝলে না। এই দুর্গত শ্রীহীন হ্রীহীন নিরানন্দ ব্যর্থ দেশে মহালক্ষ্মীর পাদপীঠে স্বদেশী সমাজের সম্ভাবনা এই কবিমান সেই প্রথমে এনেছিল একথাটা আজ এই পরিকল্পনাপ্লাবিত যুগে যেন আমরা না ভুলি। তিনি বলতেন, শুধু বিলিতি বেগুন আলু ফলিয়ে, চিরকেলে তাঁত চালিয়ে শতরঞ্জি কাপড় বুনোনই বাঁচবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। মানুষ আনবে বিজ্ঞানের শক্তি গ্রামে গ্রামে। মানুষের হাতে দেশের জল যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি যায় মরে, মলয়জ যদি বিষিয়ে ওঠে মারীবীজে, শস্যের জমি যদি হয় বন্ধ্যা, তবে কাব্যকথায় দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরি নয়, দেশ মানুষে তৈরি।

সেই মানুষই তৈরি হোক্ এই পীড়িত মূর্চ্ছিত লাঞ্ছিত দেশে, যারা বলবে আমি ভালোবেসেছি জগৎকে, প্রণাম করেছি মহৎকে, কল্পনা করেছি বৃহৎকে, বিশ্বাস করেছি মানুষকে। বলবে আমাদের ভয় নেই,

আমরা অভীঃ। পতনঅভ্যুদয় বন্ধুর পন্থার মধ্য দিয়ে যুগযুগ ধাবিত সেই চিরসারথির রথচক্রে উদয়ের পথে বলবে বাণী,

'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই।'

মরণ পারাবারের পারে যে অমর কবির কাছে এই কথা শুনেছি সেই মহামৃত্যুঞ্জয়কে প্রণাম।

ভেঙেছে দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ম্ময়
তোমারি হউক জয়।

দাও বীর্য, দাও বল, মন্যুরসি মন্যু ময়ি ধেহি, সহোঽসি সহোময়ি তুমি অমিতায়ু আয়ু করো দান, তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু হোক প্রাণবান্—প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে, জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান।

—"সুখ বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ভূমা নহে। ভূমা সুখ নহে, আনন্দ। সুখের সঙ্গে আনন্দের প্রভেদ এই যে, সুখের বিপরীত দুঃখ, কিন্তু আনন্দের বিপরীত দুঃখ নহে। শিব যেমন করিয়া হলাহল পান করিয়াছিলেন, আনন্দ তেমনি করিয়া দুঃখকে অনায়াসেই গ্রহণ করে। এমন কি, দুঃখের দ্বারাই আনন্দ আপনাকে সার্থক করে, আপনার পূর্ণতাকে উপলব্ধি করে। তাই দুঃখের তপস্যাই আনন্দের তপস্যা।"

—রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের সাধনা

গত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের 'ভারতবর্ষে' শ্রদ্ধেয় মনীষী শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় "সংসারধর্ম ও গীতা" সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ও সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছেন। লেখক মহাশয় গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি, সাধনরস রসিক, বিদগ্ধগোষ্ঠীতে তাঁর নাম শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারিত হয়। তার উপরে তিনি শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যাবলম্বনে গীতার সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার। তাঁর মতন সুধীজনের মতের কোন প্রতিবাদ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র—তবু 'জিজ্ঞাসু' হিসাবেই কয়েকটি কথা নিবেদন করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, বিশেষ করে কবিগুরুর দুএকটি লেখা উদ্ধৃত করে তিনি দেখাবার চেষ্টা করছেন যে, রবীন্দ্রনাথের মত নাকি ভারতবর্ষের সনাতন ধারার বিপরীত; তাঁর লেখায় গীতার আদর্শ, ভারতের অধ্যাত্ম আদর্শটিকে পরিস্ফুট করা হয় নাই। ঠিক কোন অবস্থায়, কি আদর্শ লইয়া রবীন্দ্রনাথ বহু নিন্দিত ও বহু প্রশংসিত "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়" ইত্যাদি কয়েকটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন সে বিষয়ে বহু আলোচনা, বাদানুবাদ বহুবর্ষ ধরিয়া বহু জায়গায় হইয়াছে, কিন্তু সত্যই কি রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সত্য অধ্যাত্ম আদর্শটিকে নিজের লেখায় ফুটিয়ে তোলেন নি। তাঁর চিত্তে মিলিত হইয়াছে, বহু তীর্থের জল, বহু সাধকের ও ভাবুকের বিচিত্র মননধারা, তাই তিনি রূপ ও অরূপ মিশিয়ে সৃষ্টি করেছেন এক অপরূপের, যা তাঁকে করে তুলেছে এক ঐন্দ্রজালিক রূপকার। অনিলবাবুর সতীর্থ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় এই ভাবপ্রয়াগকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে চারিটি ধারা তাঁর জীবনকে ও কাব্যপ্রচেষ্টাকে অভি-সিঞ্চিত করেছে। একটি হচ্ছে উপনিষদের ধারা (Upanishadic

monism), দ্বিতীয়টি হচ্ছে বৈষ্ণবের দ্বৈতভাব (Vaishnavic dualism), তৃতীয়টি ইন্দ্রিয়গত সৌন্দর্যবোধের ধারা (Paganism) এবং চতুর্থটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ (Scientific Rationalism)। "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" রবীন্দ্রনাথের নয়—তুমি নাই, আমি নাই, তুমি আমির ওপারে আছে এক শুধু অনির্বচনীয় সৎ, কিম্বা সচ্চিদানন্দের স্বরূপ শিবের মধ্যে জীব নিঃশেষে লীন লয় হইয়া গিয়াছে—একান্ত জ্ঞানীর এই উপলব্ধিও রবীন্দ্রনাথের নয়, তাঁহার অনুভব, তাঁহার সিদ্ধান্ত ভক্তের, প্রেমিকের, উন্মুখী মর্ত্যমানুষের···রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ এক শ্রেণীর অধ্যাত্মবাদী বৈরাগ্যতন্ত্রীর বিরুদ্ধে··রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি হয়ত চরম আধ্যাত্মিকতার শিখরে উঠে নাই ; তবু মানুষের সাধনায় তার স্থান বা সার্থকতা কিছু কম নয়। আমরা সাধারণ মানুষ, সাধন মার্গের পথিকও নই—তত্ত্বজ্ঞ রসিকও নই, তবু এইটুকু বুঝি, এইটুকু জানি—রবীন্দ্রনাথের বাণী অনেক অশান্ত নিশীথ রাত্রে, জীবনের অনেক দুঃসহ মুহ্যমান্ বেদনার দিনে অননুভূত শান্তির সন্ধান দিয়াছে, দিব্যভাবের দিশা দেখাইয়াছে।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টি সেই প্রত্যন্ত দেশ অতিক্রমণেরই অফুরন্ত সঙ্গীত—যে মন্ত্রমুগ্ধস্তরে অন্তরাত্মার সত্যরূপের জ্যোতি ও ধ্বনি মানবজীবনের সূক্ষ্মতর প্রকাশের মধ্যে নব নব নিগূঢ় অর্থ আনিয়া পৌঁছাইয়া দেয়।"

কবি নিজে বলেছেন—

"শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই—
আমি তো সাধক নই
আমি কবি, আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি
এ পারের খেয়ার ঘাটায়
সম্মুখে প্রাণের নদী জোয়ার ভাঁটায়

নিত্য বহে নিয়ে ছায়া আলো
মন্দ ভালো

* * * * *

সে তরঙ্গ নৃত্য ছন্দে বিচিত্র ভঙ্গীতে
চিত্ত যবে নৃত্য করে আপন সঙ্গীতে
এ বিশ্ব প্রবাহে
সে ছন্দে বন্ধন মোর মুক্তি মোর তাহে।"

তাই বিচিত্রের নর্ম বাঁশীটি নিয়ে একের চরণে প্রণাম জানিয়েছেন।

"যে নিঃশ্বাস তরঙ্গিভ
নিখিলের অশ্রুতে হাসিতে
তারে আমি ধরেছি বাঁশিতে"

তিনি কবির দৃষ্টিতে পেয়েছিলেন এক পরম সত্য—যদিদং কিঞ্চ প্রাণ এজতি নিঃসৃতং—বিশ্বসত্তার পরশ, স্থলে জলে অন্তরে অন্তরে সর্বদেহে চোখের দৃষ্টিতে জাগরণে ধেয়ানে তন্দ্রায় বিরামসমুদ্রতটে জীবনের পরম সন্ধ্যায়—প্রাণো বিরাট্, প্রাণ—সমস্ত নিয়ে, যস্য ছায়ামৃতং, যস্য মৃত্যুঃ, প্রাণো মৃত্যুঃ প্রাণ স্তক্মা, প্রাণই বেদনা—প্রাণ, প্রাণ, সমস্ত প্রাণময় বাঙ্ময়, চিন্ময় কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ—এই আকাশে দ্যুলোকে ভূলোকে যদি আনন্দ না থাকত—তিনি আছেন বলেই সব আছে—রসো বৈসঃ—তাই জগৎ জুড়ে এত রূপ এত রস এত রং এত গন্ধ এত গান এত সখ্য এত স্নেহ এত প্রেম, তাই সব পূর্ণ, মধুময়—মধুবাতা ঋতায়তে—সেই রস-সমুদ্রে অবগাহনে দোষ কি? শুধু শুষ্ক বৈরাগ্যের বুলির দরকার কি, যদি অন্তরের রস উথলে না উঠল—রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।

বাউলের কথায়—

ওরে কাজলে আর করবে কত
যদি নয়নে নজর না থাকে

প্রেম যদি না মিললো খ্যাপা
তবে তারে সাধন ভজন কদিন রাখে

বা মহাপ্রভুর কথায়

যখন সন্ন্যাস লইনু ছন্ন হইল মন
কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন

যা কিছু আনন্দ সেই রসকে পেয়ে। আনন্দরূপমমৃতং।

"এই শেষ কথা নিয়ে নিঃশ্বাস আমার যাবে থামি
কত ভালোবেসেছিনু আমি
অনন্ত রহস্যতায় উচ্ছলি আপন চারিধার
জীবন মৃত্যুরে দিল করি একাকার
বেদনার পাত্র মোর বারম্বার দিবসে নিশীথে
ভরি দিল অপূর্ব অমৃতে"।

লেখক নিজে গীতার ভূমিকায় লিখিয়াছেন "বস্তুতঃ গীতা সন্ন্যাসীদের জন্য রচিত হয় নাই, সামাজিক মানুষের জীবনে মুহূর্তে যে সব গভীর প্রশ্ন ও সমস্যা উদিত হয়, অর্জুনের সমস্যাকে উপলক্ষ্য করিয়া গীতাতে সেই সবেরই চরম সমাধান দেওয়া হইয়াছে। অর্জুনের কর্মত্যাগ সংসারত্যাগের প্রবৃত্তিকে তামসিকতা ও ক্লৈব্য বলিয়া নিন্দা করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ গীতার শিক্ষার সূত্রপাত করিয়াছেন এবং গীতার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বাহ্য সন্ন্যাস ও সংসারত্যাগের প্রতিবাদ করা হইয়াছে—ইহার জন্য প্রয়োজন ভিতরের ত্যাগ—অন্তরের সাধনা, বাহিরের সন্ন্যাস প্রয়োজনীয়ও নহে, বাঞ্ছনীয়ও নহে।

'জ্ঞেয় স নিত্য সন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি'—কর্মকে বন্ধনের কারণ বলিয়া সন্ন্যাসীরা কর্মত্যাগের উপদেশ দেন; কিন্তু গীতা বলিয়াছেন কর্মফলে আসক্তি না রাখিয়া কর্তব্যবোধে কর্ম করিলে তাহা কখনই বন্ধনের কারণ হয় না, বরং এইরূপ কর্মের ভিতর দিয়াই মানুষের

দিব্যরূপান্তর সংসাধিত হয়। ভগবান নিজের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি কখনও কর্ম পরিত্যাগ করেন না—বর্ত এব চ কর্মনি।

এই যদি গীতার সনাতন আদর্শ হয় তবে রবীন্দ্রনাথ কোথায় তার অন্যথা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন (শান্তিনিকেতন) "যদি কর্তা হতে চাই তবে মুক্ত হতে হবে—এইজন্য গীতা সেই যোগকেই কর্মযোগ বলেছেন যে যোগে আমরা অনাসক্ত হয়ে কর্ম করি। অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলেই কর্মের উপর আমার পূর্ণ অধিকার জন্মে, নইলে কর্মের সঙ্গে জড়ীভূত হয়ে আমরা কর্মেরই অঙ্গীভূত হয়ে পড়ি আমরা কর্মী হইনে। অতএব সংসারকে লাভ করতে হলে আমাদের সংসারের বাইরে যেতে হবে এবং কর্মকে সাধন করতে গেলে আসক্তি পরিহার করে আমাদের কর্ম করতে হবে।"

"যদ যদ কর্ম প্রকুর্বীত তদব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ" এই মন্ত্র ছিল রবীন্দ্রনাথের বহুভাষণের প্রিয় মন্ত্র। "তোমার সংসারকে তোমার প্রিয়জনকে তোমার সমস্ত কিছুকেই তাঁকে নিবেদন করে দাও" এই যে ত্যাগ, এ হচ্ছে সাধু কর্মের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে আত্ম-নিবেদন, যেখানে প্রত্যক্ষ হবে বুদ্ধির সর্বজনীনতা, দৃষ্টির সর্বব্যাপকতা, সর্ব মানুষের পরিপ্রেক্ষণিকায় অমৃতত্বের উপলব্ধি। এই ছিল রবীন্দ্রনাথের আদর্শ। তাঁর বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পিছনে রহিয়াছে একটা অচঞ্চল সুর—একটা ব্রাহ্মী স্থিতি—যা ভারতবর্ষের নিজস্ব চিরসত্যসুন্দরের প্রকাশ, যা 'শান্তং শিবং অদ্বৈতং' যাকে তিনি দেখেছিলেন কবির দৃষ্টিতে (সাধকের সৃষ্টিতে তিনি পেয়েছিলেন কিনা জানিনা)

"বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক্ স্তোনেদং পূর্ণং
পুরুষেণ সর্বং এক ধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদ প্রমেয়ং ধ্রুবং"
"যিনি প্রেয় পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ
সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা"।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্তের ভাষায় বলিতে গেলে—

"দ্বন্দ্বের বহুর বাহিরের উচ্ছল উদ্বেল ধারায় নিজেকে ছাড়িয়া দিয়াও একটা দৃষ্টি একটা অনুভব তিনি রাখিয়াছেন ভিতরের অন্তঃপুরের দিকে —যেখানে সব শান্ত, স্তব্ধ, স্তিমিত এবং তিনি বলিতেছেন বটে"

রাখোরে ধ্যান্ থাকরে ফুলের ডালি
ছিঁড়ুক বস্ত্র লাগুক ধূলোবালি

কিন্তু তাঁহার আসল কথাটি হচ্ছে

বাইরে তখন যাসরে ছুটে
থাকবি শুচি ধূলায় লুটে
সকল বাঁধন অঙ্গে নিয়ে
বেড়াবি স্বাধীন্
অন্তরের অন্তঃপুরে
থাকরে ততদিন।

"আমাদের বিশ্বাস মানবজাতির সমস্ত ভবিষ্যৎ এই সাধনার উপর, এই সাধনার গভীরতর সিদ্ধির উপর নির্ভর করিতেছে। এই হিসাবে কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে ঋষি রবীন্দ্রনাথ হইয়া উঠিয়াছেন।"

ধুলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যান চোখে
আলোকের অতীত আলোকে
অণু হতে অণীয়ান্ মহৎ হইতে মহীয়ান্
ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান
ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা
অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা
শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ যিনি যতবার ভুলি কেন নাম
তবু তাঁরে করেছি প্রণাম
অন্তরে লেগেছে মোর স্তব্ধ আকাশের আশীর্বাদ
ঊষালোকে আনন্দের পেয়েছি প্রসাদ।

ঋতুরঙ্গরসিক্ রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ বলতেন, বেদে একটি আশ্চর্য মন্ত্র আছে—

অন্তি সন্তং জহাতি, অন্তি সন্তং ন পশ্যতি
দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার, ন জীর্যতি—।

কাছে আছেন তাঁকে ছাড়া যায় না, কাছে আছেন তাঁকে দেখা যায় না। কিন্তু দেখো সেই দেবতাদের কাব্য, মরেও না, জীর্ণও হয় না।

অর্বিবৈ নাম দেবত তেনাস্তে পরিবৃতা তস্যা রূপেণেমে—সেই দেবতার নাম অবি, তার দ্বারাই সমস্ত পরিবৃত, তারই রূপের দ্বারা সব হয় সবুজ হরিতা হরিতস্রজঃ।

রূপনারাণের কূলে ডুব দিলাম, দেখিলাম জগৎ স্বপ্ন নয়, তাই প্রার্থনা উঠলো—

অসুনীতে পুনরাস্মস্বু চক্ষু, পুন প্রাণঃ মিহ নো ধেহি ভোগম,
জ্যোক পশ্যেমস্থূর্যমুচ্চরন্তম অনুমতে মৃড়য়ঃ ন স্বস্তি।

প্রাণের নেতা আমাকে চোখ দাও, আবার দিয়ো প্রাণ, আবার দিয়ো ভোগ, উচ্চরন্ত সূর্যকে আমি দেখবো—আমাকে স্বস্তি দিয়ো। এই ত মানুষের, এই ত সৃষ্ট জীবের, এই ত সকলের ব্যাকুলতম, আকুলতম প্রার্থনা—দেখা দাও, দেখা দাও, নয়নপথগামী হও—আমি বুঝবো, আমি জানবো, আমি ভোগ করবো—রূপে রসে ছন্দে জেগে উঠবে প্রাণের লীলারস। প্রাণ যে বিরাট, তার বিকাশ প্রতিটি অনুতে-তনুতে, তার প্রকাশ ভাবে-ভাষায় ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে, ঘরে-বাইরে, দেহে-মনে। পাগল ভোলানাথের এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হয়ে প্রকাশ পায়, আবার তারই অন্য

পদক্ষেপে অন্তরাকাশের রসলোক উন্মথিত হয়, এই হচ্ছে বিশ্বকবির বাণী। অন্তরে বাহিরে এই ঋতুচক্রের, এই যে নৃত্যছন্দ তাকেই কবিমনীষীরা বলেছেন—অখণ্ড লীলারস—একেই বলে আস্বাদন।

ঐ চাঁদ, ঐ তারা, ঐ উতলব্যাকুল বাদলধারা—ঐ তমঃপুঞ্জ গাছগুলি, এক হলো, বিরাট হলো, সম্পূর্ণ হলো আমার চেতনায়, বিশ্ব আমাকে পেয়েছে, বিশ্বকে আমি পেয়েছি, অলস কবির এই সার্থকতা। তাইতো রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বলতেন যে তিনি নটরাজের কবিশিষ্য। তাঁরই কথায় বলতে গেলে তিনি জীর্ণজগতে জন্মগ্রহণ করেন নি, চোখ মেলে যা দেখেছেন চোখ তাঁর তাতে কখনও ক্লান্ত হয় নি, তিনি বিস্ময়ের অন্ত পান নি। যুক্তি তত্ত্ব শুনতে তিনি তত্ত্ব-শিরোমণির কাছে যান নি, বাঁধন ছেঁড়ার সাধন শিখেছেন ঋতুরাজ নটেশের কাছে—যিনি সকল বন্ধন ঘুচিয়ে দেন, সুপ্তি ভাঙান, চিত্ত জাগান 'মঙ্গল লোকে অমৃতময় নব আলোকে'।

শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই
আমি ত সাধক নই
আমি কবি, আছি ধরণীর অতি কাছাকাছি
এ পারের খেয়ার ঘাটায়
সমুখে প্রাণের নদী জোয়ার ভাটায়
নিত্য বহে নিয়ে ছায়া আলো
মন্দ ভালো
সে তরঙ্গ নৃত্যছন্দে বিচিত্র ভঙ্গীতে
চিত্ত যবে নৃত্য করে আপন সঙ্গীতে
এ বিশ্বপ্রবাহে যে নিঃশ্বাস তরঙ্গিত নিখিলের অশ্রুতে হাসিতে
তারে আমি ধরেছি বাঁশীতে।

যুগে যুগে কবিরা এই ছন্দকে ধরতে চেয়েছেন, নিদাঘতপ্ত অগ্নিদিনে, হেমন্তের দিনান্ত বেলায়, শীতের কুহেলি গুণ্ঠনতলে—

শান্ত শিউলিঝরার শুক্ল রাতে
দক্ষিণের দোলালাগা পাখীজাগা বসন্ত প্রভাতে
নবমল্লিকার কোন আমন্ত্রণ দিনে
শ্রাবণের ঝিল্লীমন্দ্র সঘন সন্ধ্যায়
মুখরিত প্লাবনের অশান্ত নিশীথ রাত্রে

এই মিশ্রসুরেই বেদনাবীণার তারে তারে চেতনার মিশ্রিত ঝংকার ওঠে, প্রকাশপিয়াসী ধরিত্রী সৃষ্টির আরম্ভবীজের সুর খুঁজে বেড়ায়, শুধু বননীলিমার পেলব সীমানায় নয়, শুধু আকাশের কোণে কোণে নয়, মানুষের মনেও। অব্যক্ত হয় ব্যক্ত, সুর পায় কথা, কথায় আসে ছন্দ, ছন্দ নেয় নব আবেদন বিরহ-মিলনে, সুখে-দুঃখে, রূপের ও রসের মোহানায়। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে দেখেছি এই ঋতু বর্ণনার প্রাচুর্য। এক বর্ষা নিয়েই ব্যাস, বাল্মিকী, ভারবি, মাঘ, কালিদাসের কতো না বর্ণনা, কতো ঝংকার, কতো আলাপ, কতো আলিম্পন, বেদন নিবেদন —বর্ষার বাতাসে কতো না সুবাস, কত না আভাস, কত না আমেজ— সজল জলধরের কত না রূপ, কত না পথিকবধূ ললনার আয়ত বরাঙ্গে প্রতনু শুভ্র দুকুল, কত না বিরহিনীর বিফল যামিনী যাপন—কত কদম্ব শাল অর্জ্জুন নীপবনে কত কেতকী নাগকেশর যূথিকার ছড়াছড়ি।

নীলেষু নীলা নব বারিপূর্ণা মেঘেষু মেঘাঃ প্রতিভান্তসক্তাঃ
দবাগ্নিদগ্ধেষু দবাগ্নিদগ্ধা শৈলেষু শৈলা ইব বদ্ধমূলা।

বৈষ্ণব কবিরা ধরলেন অন্য সুর —বরষা কামিজন প্রিয় বটে, সমাগত হয়ে রাজবদুন্নত ধ্বনি করতে করতে সে এসেছে কিন্তু তার ভিতর দিয়ে মহাপ্রকৃতি পুরুষকে খুঁজছেন মহাভাবে বিভোর হয়ে—যিনি মহারাস রসিক কোথায় তিনি।

এ ঘোর বাদরে, যখন—

গগনে অবঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী চমকই

কুলিশ পাতন শবদ ঝনঝন

পবন খরতর বলগই

যখন তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী, অথির বিজুরিক পাতিয়া, তখনই বিদ্যাপতি বলেন—কৈসে গোঙায়বি হরি বিনা দিন রাতিয়া।

রবীন্দ্রনাথও ঋতুরঙ্গের কবি, তিনিও চলেছেন চিরসুন্দরের চির-প্রেমিকের সন্ধানে, তিনিও বর্ষায় আকুল হয়ে উঠেছেন কিন্তু তাঁর ঋতুকাব্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তিনি ঋতুর আহ্বানকে universalized করে ফেলেছেন। মাঘে যা প্রকৃতির রাজ্যে বাইরের বর্ণনার বর্ণাঢ্য শব্দচিত্রে কেন্দ্রীভূত, কালিদাস যাকে হৃদয়রাজ্যে প্রসারিত করে নিয়ে গেলেন, বৈষ্ণব কবি যাকে প্রেমের গাঢ় রংএ অনুরঞ্জিত করে প্রিয়কে প্রিয়তম করে তুললেন, রবীন্দ্রনাথ তাকেই বিশ্বমাঝে ছড়িয়ে দিলেন। মাঘ যখন বর্ণনা করেন—নবপলাশ-পলাশবনংপুরঃ, স্ফুটপরাগ পরাগত পঙ্কজম্। মৃদুলতান্ত-লতান্তমলোকয়ৎ স সুরভিং সুরভিং সু মনোভবৈঃ।

বা যখনি পড়ি বৃষ্টি পড়ছে—

তালীষু তারং বিটপেষু মন্দ্রম, শিলাসু রুক্ষং সলিলেষু চণ্ডম

সংগীত বীণা ইব তাড্যমানাস্তালানুসারেন পতন্তি···

তখন শব্দের ব্যঞ্জনায় রূপচিত্রণে এক রসবিদগ্ধ ছবিই মনে ফুটে ওঠে কিন্তু অলক্ষ্যের অন্তর্নিহিত রূপ তেমন সাড়া দেয় না যেমন রবীন্দ্রনাথের—

ঝর ঝর ঝর ভাদর বাদর

বিরহকাতর শর্বরী

ফিরিছে এ কোন অসীম রোদন

কানন কানন মর্মরি।

মনে হয় যেন বিরহবেদনবিধুরা শ্যামকান্তিময়ী কোন স্বপ্নমায়া রক্ত অলক্তক পায়ে ধারাসিক্ত বায়ে সারা বনময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত—রবীন্দ্রকাব্যে বর্ষার আরম্ভ আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে নয়, তার বোধন বৈশাখের পর্জন্যস্তবে, তার শেষ নবরাত্রি, বসন্তের চৈতী রাতে।

ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে বাধাবন্ধহারা

গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জন ছায়া সঞ্চারিয়া হানি দীর্ঘধারা

বসেছেন সন্ন্যাসী ঝড়ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বেঁধে, তপোবহ্নির শিখা জ্বেলে—মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের জ্বলদর্চি রেখায়—রসহীন তরু নির্জীব মরুর মাঝে, রুদ্র রৌদ্রবিকীর্ণ ধূসর প্রান্তরে কৌপীনবস্ত্র সম্বল করে তৃণাসনে আসীন মৌন—ধ্যাননিমগ্ন নীরব নগ্ন—ধূসরবসন রক্তলোচন। তিনি দুর্দম, তিনি নিশ্চিত, তিনি নিষ্ঠুর, তিনি নূতন, তিনি সহজ প্রবল স্নিগ্ধ কৃষ্ণ ভয়ংকর। ধ্যানভঙ্গ হয় বারে বারে, জটাধারীর জটা হয় প্রকম্পিত—আর্ত মানুষ বলে—তাপস নিশ্বাস বায়ে দাও মুমূর্ষুরে উড়ায়ে। উড়ে যাক্ সব কিছু মালিন্য, গ্লানি, ক্লেদ, ভয়-ভীতি, আবর্জনা-প্রবঞ্চনা, ক্ষুদ্রতা। বচন পড়েন ঋষি—হবে হবে হবে জয়, হে দেবী করিনে ভয়, হবো আমি জয়ী। তার মন্ত্র, অশোক মন্ত্র, অভয় মন্ত্র, ভূমার মন্ত্র—যো বৈ ভূমা তৎসুখং, নাল্পে সুখমস্তি—ঋষি সনৎকুমার শোকার্ত নারদকে যে মন্ত্র দিয়েছিলেন। কিন্তু কোথায় সে মহৎ, কোথায় সে বৃহৎ, বলে দাও কোথায় সে পথ—

যে পথে অনন্তলোকে চলিয়াছে ভীষণ নীরবে সে পথপ্রান্তের

এক পার্শ্বে রাখো মোরে নিরখিব বিরাট স্বরূপ যুগযুগান্তের

শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন করি ঊর্ধ্বে লয়ে যাও পঙ্ককুণ্ড হতে

মহান মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি করে দাও মোরে বজ্রের আলোতে।

ভৈরবের বাঁশী যে বজ্রেই বাজে, তাইতো জয় হয় প্রলয়ঙ্করের মরুশ্মশান সঞ্চরণ করেন যিনি—মৃত্যুসিন্ধু-সন্তর যে শংকর। এই প্রস্তুতি না হলে রসধারা ঝরে না—আরাম হতে ছিন্ন করে সেই গভীরে লওগো মোরে।

অগ্নিধ্বজ বৈশাখের অনলোদ্গীরণের পরে দাবানলদগ্ধ জ্যৈষ্ঠের

আর্তনাদ থামবে। তপের তাপের বাঁধন কাটবে রসের বর্ষণে—হৃদয় নেবে শ্যামল বধুর স্পর্শন। তখন সেই শুভলগ্নের পরক্ষণে—গগনে গগনে আপনার মনে কী খেলা তব কী লীলা। তাই কবি বললেন—চিত্ত আমার হারালো, সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসীর মনে গান ঘনালো—

গুরু গুরু গুরু নাচের ডমরু

*　　*　　*　　*

পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে ব্যাপ্ত করি সুপ্ত করি স্তরে স্তরে,
স্তবকে স্তবকে ঘনঘোর স্তূপে এসেছে বরষা নব অনুরাগিণী
—সে যে ভুবন ভরসা—পালয়িত্রী জীবধাত্রী। সঙ্গে সঙ্গে আসে মত্তমদির বাতাসে শতেক যুগের গীতিকা।

` সেই সঙ্গে মনে পড়ে আর এক যুগের আর এক কবির কথা, যিনি নবরত্ন-সভায় কবিতা পড়তেন জগতের পিতামাতাকে বন্দনা করে, তন্বী শ্যামা নিম্ননাভিবিরহিণীকে স্মরণ করে—জানামি ত্বাং প্রকৃতি-পুরুষং কামরূপং মঘোনং। সানুমান আম্রকূট, উপলব্যথিত-গতি বিশীর্ণা রেবা, বেত্রবতীকূলে পরিণত ফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে দশার্ণগ্রাম, অলকার বিদ্যুৎবন্ত ললিত বণিতারা, নবসলিল নিষেকে ছিন্ন তাপ বনান্ত আজও—মর্মে অধ্যাসীনা শ্যামমেঘস্নিগ্ধচ্ছায়া প্রিয়া ধ্যানোদ্ভবা। একদিন যে ছিল লীলাকমল-হাতে, নবকুরুবকমাথে একান্তই গৃহের সঙ্গিনী, তাকে কবি বসালেন—

ছন্দশঙ্খ রবে
অলোক আলোকদীপ্ত অলকার অম্বর গৌরবে
অনন্তের আনন্দ মন্দিরে

এমনি ঘটেছিল আর একদিন যেদিন 'মেঘৈর্মেদুরম্বরম বনভুবঃ শ্যামা-স্তমালদ্রুমৈ' অনয়ারাধিতো রাধা কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান করে তারুণ্যামৃতধারায় স্নিগ্ধ হয়ে লাবণ্যামৃতধারায় সিঞ্চিত হয়ে অভিসারে গিয়েছিলেন সামোদ দামোদরের কাছে, নাগরনারায়ণের কাছে।

রবীন্দ্রকাব্যেও বহুযুগের ওপার হতে আষাঢ় আসে—বিরহদীপন-দীপিকাও আনে। কিন্তু তার মন আর বিশ্বমন যে একই তালে বাজছে—এই হচ্ছে তার সোহং। নীড়বিরাগী হৃদয় উধাও হয় বটে, সকল আকাশ সকল ধরা বর্ষণের বাণীতে ভরেও ওঠে, চিত্তও হারায় কেকা-কলাপী রবে, কিন্তু এ বেদনা বিশ্ববিরহের সঙ্গে সুরে বাঁধা—যা ছিল একার ব্যথা তা হয়ে ওঠে বিশ্বের পুঞ্জীভূত বেদনা—জীবনের ছন্দে মেশানো, সব কিছুর রূপই ললিতে কঠোরে বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা। তাই তাঁর বর্ষাকাব্য শেষ হয় না। কৃশতনু ক্লান্ত পান্থ শ্রাবণ চলে যেতে পারে শেষ মল্লারে গান গেয়ে—ভাদ্র নদীর ভরা স্রোত বেয়ে এগিয়ে আসে শরতের অরুণ আলোর অঞ্জলি। নিবিড়-নীল অন্ধকারে শ্যামল ঘন চকিত রাতে যখন উতলধারায় বাদল ঝরে তখন কেশরকীর্ণ কদম্ববনে বেদন নিবেদনে বিরহবিধুরা মালতী কার চরণে প্রণতা, তারই খোঁজ করেন কবি। যখন 'ঘোরে ঘোরে বরখত বদ্‌রবা, গরজত বরখত চমকত বিজুরী' যখন পথিক মেঘের দল জোটে তখন কবি সঙ্গ নিয়েছেন নিরুদ্দেশের, শাসনসীমা লঙ্ঘন করে। বৈষ্ণবকবি ভাদ্রে দেখে শূন্য মন্দির মোর—রবীন্দ্রনাথ দেখছেন 'তুলছে তরী নদীর পথে তরঙ্গ বন্ধুর' মন্দির শূন্য নয়—পূর্ণ—সোনার তরীর মাঝি খেয়া পাড়ি দিচ্ছে জীবনদেবতার লাগি নৈবেদ্য হাতে। স্বয়ং গীতগোবিন্দ সে গীতাঞ্জলি প্রসন্ন মনেই গ্রহণ করবেন। ক্ষুধিত পাষাণ সে নীড়কে নষ্ট করবে না। তার গতি, বলাকার গতি, তার সুর পূরবীর সুর, মুক্তধারা আজ বিফল নয়, সে মহাসমুদ্রের সীমা-বিহীনে বিলীন হবে। তাই তিনি শুধু বিরহের কবি নন, মিলনের কবিও, ছাড়ার কবি নন, পাওয়ারও কবি—কিন্তু সে পাওয়া বিরাট-ভাবে পাওয়া, বড়ো করে পাওয়া—যে পাওয়া ছেড়ে দিয়ে পাওয়া—গতির পাওয়া। তাই বাদলশর্বরী শেষে তিনি চলেছেন ঝরা শেফালির পথ বেয়ে - ওগো অকরুণ কী মায়া জানো, মিলন ছলে বিরহ আনো—

এ তো অকারণে অশ্রুজল নয়—শিউলিফুল ত ভুল করে না—তাঁরি চরণলেখা সে ছড়িয়ে দিয়েছে পথে পথে। বর্ষার ধারায় যাঁর কণ্ঠ গদগদ, শিউলিবনে তাঁরই তান, মালতীবিতানে তাঁরই বাঁশীধ্বনি। সারদার আবাহন দিকে দিকে, নীপবনে, কাশের গুচ্ছে, নবীন ধানের মঞ্জরীতে—সে ডাকে বীরকে, বলে—লও কার্মুক, দানবের বুকে হানো, সে ডাকে প্রেমিককে বলে—ধৈর্য মানো, ওগো ধৈর্য মানো, সে ডাকে সখাকে—স্বর্গের রাখি বেঁধে দাও দক্ষিণ হাতে—আঁধারের সাথে আলোকের অর্ঘ্য নিয়ে।

এ যে ঋণ শোধের পালা—জগতের আনন্দযজ্ঞের ঋণ। লক্ষেশ্বরও বাদ পড়ে না, শোণপাংশু মহাপঞ্চকরাও নয়। শুভ্র আলোকে মন্ত্রপাঠ হয়—স্নিগ্ধ সুশান্ত নির্মলকান্ত নমো হে নমঃ। হিমের রাত এসে গেছে—হেমন্তলক্ষ্মী আঁচল দিয়ে ঘিরেছেন ধূমল রঙে কিন্তু তিনিই জীবধাত্রী অন্নদাত্রী—তুমি ক্ষুধার্ত জন শরণ্য অমৃত অন্ন ভোগ ধন্য। অন্নই ব্রহ্ম যখন সে সকলের, তাকেই বহু করতে হবে। এই তো বর্ষার দান, এই তো তার সার্থকতা। তার শেষ পরিণতি প্রেমের আত্মদানে ফাল্গুন রাতে চৈতী হাওয়ায়। কিন্তু এর মাঝে আছে উত্তর বায়, সে জানায় শাসন—কুন্দ-মালতী করিছে মিনতি হও প্রসন্ন। কোন দক্ষিণপাণির প্রসন্নতা আমরা মাগি—সব পাবার সঙ্গে সঙ্গে সব খোয়াবার দিনও যে আসে। সব খোয়াবার পর যে আবার নতুন করে পাওয়া, বড় করে পাওয়া, সেই তো আসল পাওয়া। আওল ঋতুপতিরাজ বসন্ত। দখিণ হাওয়ায় আম্রমুকুল-সৌগন্ধে, নব কিশলয়ে তার বারতা পেয়েছি, পেয়েছি পুলকিত চম্পার অভিনন্দনে, পর্ণের পাত্রে ফাল্গুন রাত্রে মুকুলিত মল্লিকার মাল্যের বন্ধনে—

যে দুর্লভ রাত্রি মম
বিকশিবে ইন্দ্রাণীর পারিজাত সম

কিন্তু তার আসন পাতবো কোথায়—প্রাণের রঙের হিন্দোলে

মর্মরিত আমার মর্ম নয়—সেই রঙে রং মেশাতে না পারলে বর্ষার সব শেষ পরিণতি ত হবে না, যা লাগবে শুধু ফাল্গুনের বনে বনে নয়, মনে মনেও—রাঙিয়ে দিয়ে যাবে যাবার আগে আপন রাগে গোপন রাগে। চৈত্র সন্ধ্যায় যখন বাতাস হবে উতলা আকুল, পথতরুশাখে মুকুল ধরবে, রাজার কাননে বকুল ফুটবে সেদিনই ঋতুযজ্ঞের পূর্ণ আহুতি, বর্ষচক্রের শেষ সমিধ সংগ্রহ। সেদিন সালতামামীর দিন নয়, কী পাইনি তার হিসাবনিকাশ মিলাবার দিন নয়। সেদিন মানুষের নিজেকে নিজের আবিষ্কারের দিন, যে মানুষ অসংখ্য যুগের একান্ত শেষ উত্তরাধিকারী। সেদিন একটি বাণীমঞ্জরী শুধু সঙ্কলিতা হোক—যাবার বেলায় কিছু মোরে দিয়ে যেয়ো—একটু আশ্বাস, একটু বিশ্বাস, একটুখানি বীর্য, একটুখানি শৌর্য, একটু ধৈর্য, তেজ, একটু ক্ষমা, একটু আশা, একটু ভালবাসা।

এই ধুলো মাটি ঘাস, ঝরঝর বরষার মাঝেই কবি যে তাঁর হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেছেন—যারা মাটির কোলে আছে, যারা মাটিতে হাঁটতে আরম্ভ করে, মাটিতেই শেষ বিশ্রাম করে, সেই পায়ে চলার দলের সকলের বন্ধু যে তিনি—

পথের সাথী নমি বারংবার
পথিক জনের লহ নমস্কার।

শ্রীঅরবিন্দের প্রথম যুগের একটি নাটক ও শেষের যুগের কয়েকটি কবিতা

কবি মাত্রেই দ্রষ্টা অর্থাৎ যিনি দেখছেন, দর্শন করছেন। কিন্তু আসল কবি সঙ্গে সঙ্গে স্রষ্টাও। কল্পনাশ্রয়ী মন শুধু বাইরের জগতকেই মনের লীলার সঙ্গে গ্রথিত করছে না, তাকে পদে পদে রূপায়িত করে বৈচিত্র্যময় করে চঞ্চলা নদীর মতো নৃত্যরত নবনব রূপে বিকশিতও করছে। তাই সত্যিকার কবিরা শুধু দার্শনিক নন্, যোগীও অর্থাৎ যুক্তও হচ্চেন, এবং সে যোগ মানসযোগ। গীতায় যোগীকে তপস্বী জ্ঞানী কর্মীর উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে—তস্মাদ যোগী ভবার্জুন—বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো—কারণ যোগী যিনি তিনি দ্রষ্টা ও স্রষ্টা, দার্শনিক ও মনীষী, অর্ধনারীশ্বর নন, সাধনায় উর্ধ্বনারীশ্বরও। এর ইঙ্গিত আমরা বহুবার বহুভাবে শ্রীঅরবিন্দের প্রথম যুগের কাব্যেও প্রচুর পেয়েছি। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই—শুধু একটি নাটকের কথাই সামান্যভাবে উল্লেখ করবো, যা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এটি হচ্চে তাঁর প্রাক-পণ্ডিচারী যুগের লেখা, নাম "বসোরার উজীর"। এটির কথা বলছি, কেননা এটিকে বলা যেতে পারে শ্রীঅরবিন্দের ওমরখৈয়ামী নাটক। হঠাৎ দেখলে মনে হবে এটি একটি তরল চটুল রোমান্টিক নাটক, অবাস্তব আরব্য উপন্যাসের রঙে রঙিন। সুরা ও নারীর কল্লোল এর প্রতি ছত্রে—বাঁদী বান্দা, উজীর নাজীর, শাহনশাহ, আমীর-ওমরাহের দল ভিড় জমিয়েছে ভোগের উছল ধারার মাঝখানে, বাজারে নারী পণ্যা, কেনাবেচা হচ্চে তার দেহটা। এই নাটকটির দোষগুণ-ক্রুটির বিচার স্থগিত রেখেও মনে হয় যে, এর মুখর উচ্ছ্বাসের মধ্যেও

একটা শান্তম শিবমের আভাস আছে যা শ্রীঅরবিন্দের কাব্যের মূল উপাদান, মুখ্য অবদান। একদিকে পড়ছি—

Chunk—a chink—a chink
We will kiss and drink
And be merry, O very very merry
For your eyes are bright
Even by candle light
And your lips are red as the red round
cherry.

সুরার সাথে সুন্দরীদের চটুল ঠোঁটের ধূম কি কবিকে শুধুই বলে যে, স্ফুর্তি করো স্ফুর্তি করো—"স্ফূরতি রতিপতি" "তবে ঢাল সুরা, ঢাল সুরা, ঢাল ঢাল ঢাল" না "প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে"।

সাঁঝের বাতির ক্ষীণ আলোতে চকচকে ঐ চোখ দুটি
তোমার ঐ দিলমাতানো চেরীগলানো রঙিন রাঙা ঠোঁট দুটি

তাকে কি কেবল ভোলালোই, না জাগালোও।

আবার পড়ি—

When I was a young man
I'd a very good plan
Every maid that I met
In my lap I would set
What mattered her age, or her colour
But now I am old
And the girls they grow cold
And my heartstrings they ache
At the faces they make
And my dancing is turned into dolour.

যখন আমি ছিলাম তরুণ, বয়স ছিল কাঁচা
পৃথ্বী ছিল অরুণ বরণ সরমে রাঙা খাঁচা,
তখন যদি কোনো মেয়ে আসতো ঢেউয়ে ধেয়ে
কোলে আমার বসিয়ে নিতাম রূপসাগরের নেয়ে
হোক্ না তার বয়স বেশী তন্বী নাই বা হলো
শ্যামাঙ্গিনী যোলো কিম্বা নয়তো কালো-ধলো
এখন আমি বৃদ্ধ জীর্ণ জরায় শিথিল তনু
তরুণীরা পালায় ভয়ে কম্পিত পরম অণু
পরাণ আমার রোদনভরা বেদন জরজর
কেবলই শুনি কানে ধ্বনি, সরো, সরো, সরো
দেখতে যদি কি ভ্রুভঙ্গী এখন আমার জোটে
পায়ের তলায় নৃত্যের তাল বেতাল হয়ে ফোটে।

সঙ্গে সঙ্গেই পড়ি

Heart of mine, O heart impatient
Thou must learn to wait and weep
Wherfore would thou go on beating
When I bade thee hush and sleep
Thou who wert of life so fain
Did thou know not life was pain.

ধৈর্য ধরো ধৈর্য ধরো, হে অধীর স্তব্ধ হও
মন রে আমার ঘুমিয়ে পড়ো
হৃদয় আমার শান্ত রও।
ধুকধুকুনি বন্ধ করে কাঁদতে শেখো, কাঁদতে শেখো
প্রতীক্ষারি পত্রখানি চোখের জলে ভিজিয়ে লেখো

বেঁচে থাকার জারকেতে করলে ত অনেক লাফালাফি
মদির দিনের নেশায় মেতে মাতাল মত দাপাদাপি
জানো নাকি জীবন কেবল বেদনাতে ছলছল
রোদনভরা ব্যথার সুরে করে শুধুই টলমল
মন রে ধৈর্য ধরো ধৈর্য ধরো।

নাটকে অন্য সুর আসছে—শুধু ঝঙ্কার নয়, উচ্ছলতা নয়, স্ফূর্তি নয়, বেদনার কথাও, যা সত্য শাশ্বত। সাবিত্রীতে এই কথাই পড়লাম নতুন করে পরিমার্জিত হয়ে, আরো গভীরতর বোধি চেতনায় দীপ্ত হয়ে—

Pain is the hand of nature sculpturing men
to greatness.

ব্যথা দিয়ে, বেদনা দিয়ে আঁধার রাতে দুঃখের দিনেই জীবনদেবতা বা মহাপ্রকৃতি গড়ে নেন আমাদের, তাই তো এর পরের কথাই হলো—

Men die, that Man may live and God be born.

আমার মধ্যেই যে তিনি জন্ম নিচ্ছেন যিনি আমার দেবতা, আমার মিতা, আমার সত্তা, আমার সত্য, আমার নিত্য। সেই বোধের আগমনী শুনছি এনিস্ এঞ্জালিসের প্রেমে, তার কথায় তার গানে—

King of my heart, wilt thou adore me
Call me goddess, call me thine ?
I too will bow myself before thee
As in a shrine
Till we with mutual adoration
And holy earth-defying passion
Do really grow divine.

রাজা, ওগো হৃদয়পুরের রাজা,
কবে আমায় নিজের হাতে করবে তুমি পূজা।

অর্থাৎ নারীর প্রেমই তাকে উর্ধ্বে নিয়ে গেছে—সে তোমার সামনে

যেন মন্দিরে প্রণতা, প্রেমের বলে অন্তরে বাহিরে সে দেবীত্ব পেয়েছে এবং পরস্পরের স্নেহে ভালবাসায়

তুইএর মিলনে পৃথ্বী কামনা ঊর্ধ্বে উঠিবে জিতি
দিব্য যিনি তাঁরই আধারে প্রতিটি নিতি নিতি।

তাই নাটকের শেষে যবনিকা পাত করলেন খালিফ্ হারুণ অল রশীদ, প্রেমিক প্রেমিকাকে বললেন--মনে রেখো জীবন শুধু স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, ভোগ নয়, হাসির নীচে আছে এক গম্ভীর গভীর রূপ—সেই চলার পথে যেন সংযত আনন্দে আমরা পা ফেলতে পারি, আর বলি, হে পরম কারুণিক, করুণা মহার্ণব, যদি পদস্খলন হয়, তবে শক্ত করে আমার হাত ধরে উপরের দিকে নিয়ে চলো তুমি—তুমি ত ভীষণ নও, নির্মম বিচারক নও, তুমি যে পিতা—পিতা নোহসি, পিতা নো বোধি।

শ্রীঅরবিন্দের মর্ত্যজীবনের শেষ অধ্যায়ে রচিত কতকগুলি কবিতা নির্বাচিত করে 'Last Poems' নাম দিয়ে পণ্ডিচারী আশ্রম থেকে প্রকাশিত করা হয়েছে। মনে রাখা দরকার, সাবিত্রীর লেখা তখনও চলছে। কবির মনে সেই বিরাটের, সেই অপরূপের, সেই স্তব্ধের ঝঙ্কার কাজ করে যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'যে-সব ঊষা হয়নি উদিত সে-সব ঊষার মাঝে' অনাদ্যন্তবান্ নিত্যনূতন রূপ নিচ্ছেন। কবিতাগুলি ১৯৩৭ সালের পরের। More Poems-এও ঐ যুগের কতকগুলি কবিতা আছে। এই কবিতাগুলি সনেট জাতীয় হলেও সাধারণ সনেট নয়। মহাসাধক লীলাজলধি তীরে মনিমাণিক্যময় শুক্তিমুক্তা কুড়িয়ে কাব্যহার গাঁথছেন, আবার 'প্রেমতরঙ্গে অঙ্গ অবগাই' গভীরতার মধ্যে ডুবে যাচ্ছেন। তাঁর কাছে সব দর্শনই সমদর্শন, সব শব্দই শব্দব্রহ্মের।

All sounds, all voices have become thy voice.

কবির মনে—

A secret harmony steals through the blind heart
And all grows beautiful because thou art.

তুমি আছ বলেই সব সুন্দর, সব সামঞ্জস্যপূর্ণ—এ অনুভূতি কবি ও সাধকের মিলিত অনুভূতি, বিশ্বের ছন্দের সঙ্গে একতারাতে বাঁধা।

The world's happiness flows through me like wine
Its million sorrows are my agonies.

এই পৃথিবীর যা কিছু সুখ সবই উচ্ছল সুরার মতো আমার শিরায় বইছে, আবার লক্ষ লক্ষ দুঃখবেদনাও আমারই বেদনা—

All Nature is the nursling of my care,
I am its struggle and the eternal rest ;
The world's joy thrilling runs through me, I bear
The sorrow of millions in my lonely breast.

সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে কবি একাত্মীভূত—জীবন তারই passion play.

I spread life's burning wings of rapture and pain,
Black fire and gold fire strove towards one bliss
I rose by them towards a supernal plane
Of power and love and deathless ecstasies.

এই ত অগ্নিমেখলা জীবনের দুই দিক্—অনললাঞ্ছিত দুইপক্ষ বিধূনিত করে কল্পনাতীত সৃষ্টির উষা হতে আমি চলেছি ঊর্ধ্বের এক তুরীয় জগতে, যেখানে শুধু শক্তি নয়, রবীন্দ্রনাথের কথায়—

নিবিড় নিশা নিকষ ঘন কালোর পারে
পরাণ দিয়ে প্রেমের দীপ জ্বলে ওঠে

মৃত্যুহীন পরম উল্লাসে, চরমতার হ্লাদে, নিবিড় সার্থকতায়।

আবার The Golden Light কবিতাটি ধরুন। যোগজীবনের ঊর্ধ্বের আলোর অবতরণের এক অপূর্ব রহস্যকে কাব্যসুষমায় মণ্ডিত করলেন কবি—এর মধ্যে দর্শন আছে মানি কিন্তু কাব্যও আছে—

Thy golden light came down into my brain
And the grey worms of mind suntouched became.

কবি বলছেন, সেই স্বর্ণময় দ্যুতি আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করল, সূর্য-স্পর্শ তিনি পেলেন—জীবনে কী এল—

A calm illumination and a flame.

একটা প্রশান্তিময় আলোর রেখা, একটু অগ্নিশিখা। ঐ আলো নিম্নের দিকে আরো নামলো—

Thy golden light came down into my throat

* * * *

My words are drunk with the Immortal's wine

দিব্যের সুর ঝঙ্কার দিচ্ছে আমার কথায়, আমার বাণীতে, কাহিনীতে ; অমৃত সুরা ঝরে পড়ছে—

ঐ আলো আরো নামলো—

Thy golden light came down into my heart

আমার বুকে এসে লাগল সেই আলোর দীপ্তি—

Now it has grown a temple where thou art
And all its passions point towards only Thee.

আমার মনোমন্দিরে তুমি প্রতিষ্ঠিত হলে হে আলোর দেবতা,
আমার হৃদয় হলো তোমার হিরণ্ময় পাত্র—আমার সব কিছু
উদগ্র আকুলতা ধায় যেন তোমার পানে তোমার পানে।

সাধারণতঃ কবির দল মনোরাজ্যে এই আলোকে প্রতিষ্ঠিত করেই বিদায় নিতেন, কিন্তু কবি অরবিন্দের কল্পনায় এ আলো আরো নামলো,—শেষ পর্যন্ত—

Thy golden light came down into my feet
My earth is now thy playfield and thy seat.

শেষ পর্যন্ত এই দিব্যের প্রতীক হিরণ্ময় দ্যুতি পৌঁছল আমার চরণ যুগলে, স্পর্শ করলে মাটি—মধুমৎ রজ মিশলো মধুমৎ দৌ-এর সঙ্গে—আমার ভুবন হলো তোমার ভবন, তোমার লীলাক্ষেত্র, তোমার

আসন। রবীন্দ্রনাথও প্রায় এই কথাই বললেন যাবার দিনের আগে, প্রাচীন ঋষিদের কথার অনুবৃত্তি করে—

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধুলি
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।

এই অনুভূতিও ঊর্ধ্বের অনুভূতি, কিন্তু অরবিন্দ-কাব্য-সাধনার মূলকথা মাটিকে গ্রহণ করে, তাকে রূপান্তরিত করে, আসল ঐতিহ্যটিকে ধরা, কারণ মাটিই মূলে সোনা। কামিনীকাঞ্চনকে তথা-কথিত ত্যাগ করে নয়, তার অস্তিত্বকে নিজের সর্বগ্রাসী অস্তিত্বের সঙ্গে একাত্মীভূত করে, উত্তরণ অবতরণের মধ্যে—

Her face She lifts to Him who is Herself, until
The spirit leaps into the spirit's embrace.

এই যে সত্তার সঙ্গে সত্তার মিলন—এ মিলন পরম রমণের পরমা রমার, পুরুষ প্রকৃতির, শিব ও শিবানীর, অর্ধনারীশ্বরের। এখানে ছোট্ট আমি বিরাট আমিতে মিলিয়ে গেছে, ক্ষুদ্র অহং বৃহতের মহা-সাগরে বিলীন—

I have escaped and the small self is dead ;
I am immortal, alone ineffable
I have gone out from the universe I made
And have grown nameless and immeasurable.

এ আমি ছোট্ট গণ্ডীর পরিধি থেকে পালিয়ে-আসা আমি, যে ক্ষুদ্র আমি মরে গেছে, যে আমি অমর, একক্ পরিবর্তনহীন, যে আমি নিজের তৈয়ারী জগৎ থেকে বেরিয়ে এসেছে, যে আমি নামহীন, সংখ্যাগণনার অতীত।

কিন্তু সমালোচক বলবেন, এখানে ত দার্শনিক স্থিতপ্রজ্ঞ ঔপনিষদ

অরবিন্দকেই দেখছি, কবি অরবিন্দ কোথায়? কবি বলতে যদি ধন্যা-লোক বিলাসীকেই বুঝি তাহলেও দেখি, বসে আছেন সেই চিরকালের শ্রুতিধর কবি—তিনি কৃষ্ণকে দেখেছেন, তাঁর বাঁশী শুনেছেন—

I have seen the beauty of immortal eyes
And heard the passion of the lover's flute,
And known a death ecstasy's surprise
And sorrow in my heart for ever mute.
Nearer, nearer, now the music draws
Life shudders with a strange felicity ;
All Nature is a wide enamoured pause.
Hoping her lord to touch, to clasp, to be.

কবি বলছেন—

আমি যে দেখেছি সেই অমর আঁখির সুষমাকে
আমি যে শুনেছি সেই চির প্রেমিকের বাঁশরী,
আমি যে জেনেছি মৃত্যুহীন উল্লাসের বিস্ময়
জেগেছে আমার বুকে নির্বাক দুঃখ নিরতিশয়

কবির কাছে সেই অমৃত সঙ্গীত আরো এগিয়ে আসছে—

জীবন কাঁপে থর থর অপূর্ব আভাসে
সমস্ত প্রকৃতি স্তব্ধ-আবেগে ভাষাহীন মূক
পরমপতির স্পর্শ সে চাইছে—ওধু স্পর্শ নয়, গভীর
আলিঙ্গন, শুধু আলিঙ্গন নয়, সে হতে চাইছে—

একাত্মীভূত, তাও নয়—শেষ পর্যন্ত to be—অর্থাৎ রূপান্তরিত হতে চাচ্ছে। সাধকের উপর উঠলেন কবি, বললেন—

For this one moment lived the ages past
The world now throbs fulfilled in me at last.

সেই একটি চরমক্ষণের গানই গাইলেন কবি, যার মধ্য দিয়ে ধরণী ধন্য হয়, পৃথ্বী কৃতকৃতার্থ হয়।

তাঁর 'Self' নামক সনেটে এই ভাবটির আর একটি কাব্যময়, দর্শনময় কিন্তু কৌতুকভরা রূপ ফুটে বেরিয়েছে।

He said "I am egoless spiritual, free."
Then swore because his dinner was not ready
I asked him why. He said "It is not me,
But the belly's hungry god who gets unsteady."

সে বললে—আমি সেই আত্মাভিমানশূন্য সেই অনাদি সত্তার বাহন, আমি মুক্ত,—পরমুহূর্তে সে শপথ করতে লাগল যে, তার নৈশ-ভোজ দেরি হচ্ছে কেন? আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—এ কী তোমার ব্যবহার? সে জবাব দিলে—এই তো লীলা—এ আমি ত সে আমি নই—এ হচ্ছে আমার ক্ষুধিত জঠর-দেবতা, যিনি জাগ্রৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছেন—

He answered "I can understand your doubt
But to be free is all. It does not matter
How you may kick and howl and rage and shout,
Making a row over your daily platter.

কিন্তু সাধারণ পাঠক বলবেন—ব্যাপারটা হলো কী—To be aware of self is liberty—নিজের সত্তাকে চিনে নাও—তবেই মুক্তি।

আবার এ যুগে আর এক ধরনের কবিতা দেখছি—একটি ছোট্ট মার্জারকন্যাকে ঘিরে কবির স্বপ্ন উধাও হয়েছে—

Mute stands she, lonely on the topmost stair,
An image of magnificent despair!

শুধু তাই নয়, কবির উপমা স্তূপীকৃত হচ্ছে—সেই বিড়ালিনী 'stately', 'grandiose', 'full of grace.'

The grandeur of a sorrowful surmise
Wakes in the largeness of her glorious eyes,
In her beauty's dumb significant pose I find
The tragedy of her mysterious mind.

কবি সেই তপস্বিনীকে রঙে রঙিন করে আঁকলেন—এ কথাও তাঁর চক্ষু এড়াল না যে—

Her tail is up like an unconquered flag;
Its dignity knows not the right to wag.

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবি-মানস প্রশ্ন করছে,

Whether she is spirit, woman or a cat
Is now the problem I am wondering at.

ক্রিটিক বলবেন যে মহাযোগীর চিন্তায় তার শেষের যুগের কবিতাতেও এ দ্বিধা কেন?—ব্রাহ্মী স্থিতিতে বসে এ প্রশ্ন উঠবে কেন? কবি ডাইলান টমাসের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত তাঁর একটি প্রবন্ধে—After the first death there is no other.—আদি মৃত্যু ছাড়া যেমন মৃত্যু নেই, আদি অনুভূতি ছাড়াও অনুভূতি নেই, সমতাই যদি জীবনের কাম্য হয়, আত্মস্থ পুরুষের স্বচ্ছন্দতাই যদি তপস্যার শেষ ফল হয় তাহলে অনুভূতির সমতাও প্রয়োজন। সেই—উপলব্ধিই সাধনার শেষ কথা। বিশ্বভারতী পত্রিকায় বাংলা কাব্যে মিষ্টিক ধারার কথা বলতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় গুপ্ত মহাশয় এর রূপটি চমৎকার ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তা অন্য প্রসঙ্গে বক্তব্য হলেও এ ক্ষেত্রেও বলা চলে—

"বিদেশী চেতনার প্লাবনে ভেসে গেল এসব। মন বুদ্ধি, বহির্বিষয়ক জ্ঞান পুঞ্জীভূত হয়ে চলল। বাঙালীর শিক্ষাদীক্ষা সর্বতো-ভাবে একান্তভাবেই আধুনিক হয়ে উঠল। রামমোহন ঈশ্বরচন্দ্র মধুসূদন বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই যে সব দিক্‌পাল, তাঁদের চেতনায় ও সৃষ্টিতে বহির্মুখী জ্ঞান বিপুল হয়ে উঠেছে—তার শুভ পরিণাম এই যে, আধুনিক জগতে তিষ্ঠিবার, ভবিষ্যৎ জগতের দিকে অভিযান করবার আয়ুধ আমরা সম্যক্‌ আহরণ করেছি। তবে এঁদের মধ্যে প্রাচীনতর দীক্ষার ফল্গুপ্রবাহ নিভৃতে রয়ে গিয়েছে। এবং আবার তা

বাঙ্‌ময় হয়ে সুষ্ঠু রূপ নিয়ে নিঃসৃত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এবং রাবীন্দ্রিক পরিমণ্ডলের মধ্যে। এই অন্তঃশীলা ধারা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রকট হয়েছে আবার—পেয়েছে মানসোচিত রূপায়ণ, আধুনিক তাত্ত্বিক বা দার্শনিক বুদ্ধিগত সিদ্ধান্তের আকার। অন্তরাত্মাগত সগোত্র। ভাষা মার্জিত শাণিত হয়ে উঠেছে, ভাব চিন্তাগর্ভ হয়ে উঠেছে, চেতনায় এসেছে একটা ঔদার্য ও বিশ্বমুখিতা। তবুও একটা পুরাতনী সনাতনী মূর্ছনা, অনাহত বাণী একটা সমানে প্রতিরণিত হয়ে উঠেছে এখানেও। একটা বিদ্যুৎগর্ভ মন্ত্র, অন্তরাত্মাগত চিন্ময় বাক্—অতিলৌকিক রহস্যের সঙ্গে, সত্যতম সুন্দরতম নিভৃত অত্যাশ্চর্যের সঙ্গে, আমাদের পরিচয় ও সংযোগ ঘটিয়ে দেয় যা—তাই তো হবে ভাবী কাব্য ও কবিতা।" শ্রীঅরবিন্দ কাব্য সেই ভবিষ্যতেরই প্রতিফলন প্রকাশ করতে চাইছে—অচিন্ত্য অনুভূতি ও লোকাতীত রহস্য—"আমাদের চেতনা যত গভীরে যত ঊর্ধ্বে যায়, যত নিভৃত লোকে আমাদের স্থিতিগতি হয় আমাদের অনুভবের অভিজ্ঞতার প্রকাশ হয় ভিন্ন বাক্যে ও ছন্দে"।

—সমাপ্ত—